আল মাহমুদ

কবির কররেখা

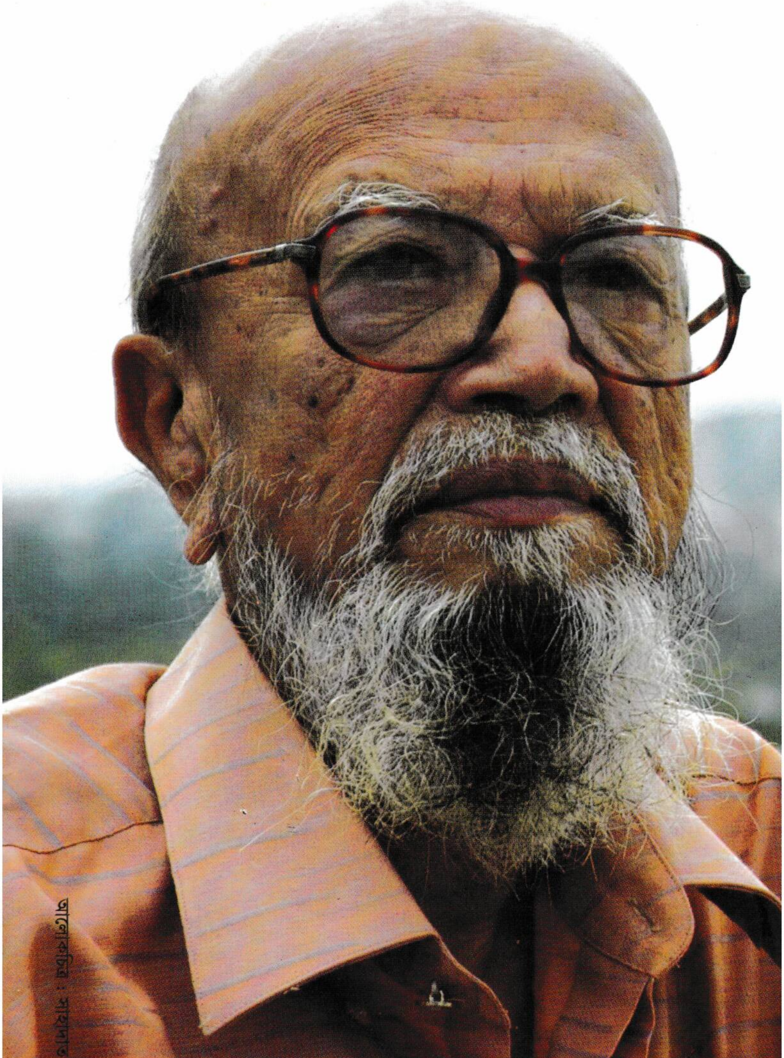
আলোকচিত্র : সাহাদাত পারভেজ

কবির কররেখা | আল মাহমুদ

কবির কররেখা

কবির প্রথম পাঠ

আল মাহমুদ

সূচীপত্র

ঢাকা, বাংলাদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃজনশীল প্রকাশনায় ২৫ বছর

প্রকাশক ❑ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ❑ ০১৭১১-৫৮৩০৪৯

কবির করেরেখা

কবির প্রথম পাঠ

আল মাহমুদ

প্রথম মুদ্রণ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
প্রচ্ছদ ❑ নিয়াজ চৌধুরী তুলি
স্বত্ব ❑ সৈয়দা নাদিরা বেগম
বর্ণবিন্যাস ❑ রেজোয়ানা জামান
৪৭/১ বাংলাবাজার, (৩য় তলা) ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ ❑ সাদাত প্রিন্টিং প্রেস, ১৪ কবিরাজ গলি লেন, ঢাকা ১১০০

ভারতে পরিবেশক ❑ রাজু বুক স্টোর স্টল নং ৭, ব্লক-২, কলেজ স্কয়ার (দক্ষিণ), সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক ❑ মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট্স, নিউ ইয়র্ক, www.muktadhara.com,
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ❑ সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন,
কানাডায় পরিবেশক ❑ এটিএন বুক এন্ড ক্রাফ্টস ২৯৭০ ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরেন্টো
অনলাইন বুকশপ ❑ www.rokomari.com/sucheepatra

Kabir Karorekha
Kabir Protham Path
by Al Mahmud

Published by Saeed Bari, *Chief Executive*, Sucheepatra,
38/2Ka Banglabazar Dhaka 1100, Bangladesh.
Ph (880-2) 01711-583049
e-mail saeedbari07@gmail.com
www.facebook.com/sucheepatra
Price BDT. 100.00 Only. US $ 5.00. £ 3.00

মূল্য : ৳ ১০০.০০ মাত্র

ISBN 978-984-92130-0-0

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও মতামত গ্রন্থকারের নিজস্ব -প্রকাশক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির কররেখা

কবির প্রথম পাঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ|ৎ|স|র্গ

আসাদ চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল মাহমুদ শুধু একজন অসাধারণ কবি-ই নন একজন কাব্য দার্শনিক, দ্রষ্টাও বটে। যাপিত জীবন ছেনে তিনি তৈরি করেন কবি ও কবিতার পথ। *'কবির কররেখা কবির প্রথম পাঠ'* তেমন-ই এক দরকারী গদ্য গ্রন্থ যা বাংলাভাষার আগ্রহী লেখক-পাঠকদের জন্য অবশ্য পাঠ্য।

সাঈদ বারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

মানুষ মাত্রই কবি। মানুষের উদ্ভব ও বিবর্তন কীভাবে হয়েছে সেটা তর্কসাপেক্ষ বিষয় হলেও মানুষ যদি কবি না হতো, তাহলে এ পৃথিবী নামক গ্রহটি তার জন্য সহনীয় বিষয় হতো না। মানুষ কবি বলেই সে এ গ্রহে স্বপ্নের সঙ্গে রুক্ষ-কঠোর বাস্তবতাকে মিলিয়ে এটা মানুষের জন্য বাসযোগ্য করে তুলেছে। কোনো বিষয়কে এর বস্তুতান্ত্রিক অবস্থান থেকে একটু বাড়িয়ে একটু কল্পনায় প্রসারিত করে দেখার স্বভাব অন্য কোনো প্রাণীর নেই। পশুদের নেই, পাখিদেরও নেই। একমাত্র মানুষই পারে বাস্তবকে কল্পনায় মিশ্রিত করে একটু বাড়িয়ে দেখার। সে যখন নদীকে দেখে তখন সেটা শুধু একটা জলধারা কিংবা স্রোতধারা থাকে না। যখন নারীকে দেখে তখন সেই নারী পরীটরী না হলেও স্বপ্নের পোশাকে সে সজ্জিত হয়ে যায়। প্রকাশ্যে অর্ধেক বাস্তবতায় উদ্ভাসিত মেয়েটি কল্পনায় বাকি বাস্তবতা অলংকৃত–হয়ে স্বপ্ন তৈরি করে। এ অর্থেই কবিরা বলেন, 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।'

মানুষ মাত্রই যে কবি এর উদ্ভব হয়েছিল আদমের উদ্ভবের মুহূর্তে। ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, আদমকে মাটি থেকে তৈরি করে সৃষ্টিকর্তা তার মধ্যে ফুঁৎকারে প্রাণের সঞ্চার করেন। তারপর তাকে ফেরেশতাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করা হয়, তোমরা আমার এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয়ের নাম জান কী? এতে ফেরেশতাগণ হতবাক হয়ে যান এবং মহান সৃষ্টিকর্তাকে জানান, প্রভু আপনি না জানালে আমরা কিছুই জানি না। সৃষ্টিকর্তা আদমের দিকে ফিরলেন। বললেন, হে আদম তুমি আমার সৃষ্টিনিচয়ের নাম বলে দাও। আদম তার চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, এটা গাছ, এটা পাখি। এভাবে সব সৃষ্টির নাম রাখতে শুরু করলেন আদম। নাম রাখা ও নামে ডাকার শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতেই প্রতীয়মান হয়, সৃষ্টি মুহূর্ত থেকেই আদম কবি হয়ে উঠেছিলেন। কারণ যে নাম উচ্চারণ করে প্রকৃতপক্ষে তার অজ্ঞানতার অন্ধকার অনেকটাই তখন কেটে গেছে ধরে নিতে হবে।

এ বিস্ময়কর ঘটনার পর আল্লাহ ফেরেশতা ও জিনদের আদমকে সিজদা করতে আদেশ দিলেন। সবাই ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু একমাত্র ইবলিশ, যে কিনা জিনদের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, যাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল আগুনের শিখা থেকে সে মাথা ঝুঁকালো না।

এ অবাধ্যতা ছিল প্রভুর দৃষ্টিতে অত্যন্ত অন্যায় এবং তার নিয়মের ও আনুগত্যের শৃঙ্খলার বিপরীতধর্মী। আল্লাহ ইবলিশের দিকে ফিরে বললেন, কে তোমাকে বাধা দিয়েছে। কেন তুমি আদমকে সিজদা করলে না। ইবলিশ বলল, তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ, আর তাকে সৃষ্টি করেছ পচা মাটি থেকে। এই অবাধ্য উত্তর সৃষ্টিকর্তাকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। তিনি বললেন, তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ। তুমি এই উদ্যান থেকে বাইরে চলে যাও।

মুহূর্তেই ইবলিশ তার জন্য একটু অবকাশ প্রার্থনা করে বলল, আমাকে অবকাশ দাও প্রভু। আমি দেখব আদম কিসে আমার চেয়ে উন্নত সৃষ্টি। আমি আকাশে বাতাসে সর্বত্র তার জন্য ফাঁদ পেতে রাখব অবাধ্যতার। তুমি তাকে বাধ্য, তোমার অনুগত সৃষ্টি হিসেবে পাবে না। আমি আদমের বিরুদ্ধে সর্বত্র যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

আল্লাহ আদমের দিকে ফিরতেই আদম জবাব দিল, জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে, স্বপ্নে কিংবা মর্ত্যে সর্বত্রই এই ইবলিশ শয়তানের বিরুদ্ধে তার ঘোষিত যুদ্ধের ডাকে কি জবাব দান করব। আমি লড়াই চালিয়ে যাব হে প্রভু, তোমার নিয়ম-শৃঙ্খলার পক্ষে। এভাবেই আদমের সঙ্গে অমঙ্গলের লড়াই শুরু হলো।

অন্যদিকে মহান প্রভু আদমকে অ্যাডেন উদ্যানে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি দিলেন এবং এর ফল ও আহার্য হালাল করে দিলেন। তিনি সব খেতে পারবেন, ভোগ করতে পারবেন নিঃশঙ্কচিত্তে। কিন্তু একটি বৃক্ষের দিকে আদমকে নিষেধ করা হলো যে, এ বৃক্ষের কাছে যাবে না, এর ফল ভোগ করবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি তা করো, তাহলে আমি তোমাকে কঠোরতর দণ্ড দান করব। আদম প্রভুর নির্দেশ মেনে স্বর্গোদ্যানে বিচরণশীল থাকলেন।

মহান প্রভু মানুষের সৃষ্টিকর্তা আদমের এই একাকী ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে যে নিঃসঙ্গের বেদনা রয়েছে, তা অনুভব করলেন। আদম যে একাকী এই বোধ কী আদমের ছিল? এই বোধ নিশ্চয় তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যেই প্রথম উদিত হয়ে থাকবে। তিনি ভাবলেন সঙ্গী দরকার। তিনি আদমকে নিদ্রায় বিহ্বল রেখে তার বাঁ পাশ কেটে বের করলেন ঈভকে। ঈভ যখন পূর্ণগঠিতা তখন আদমের মোহ নিদ্রা ছুটে গেল এবং পাশ ফিরেই দেখলেন ঈভকে। যেহেতু ঈভ আদমেরই অস্তিত্বের একটি অংশ সেজন্য ঈভের প্রতি আদমের গভীর প্রেমপ্রীতি, মমত্ববোধ, সর্বোপরি ভালোবাসা সৃষ্টি হলো।

ইবলিশ অত্যন্ত ঈর্ষাকাতর হয়ে আদমের ইডেন উদ্যানে এই ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন লক্ষ্য করে দারুণভাবে অন্তর্জ্বালায় ভুগতে লাগল। সে সংকল্প করল আদমকে যে করেই হোক স্বর্গচ্যুত করতে হবে এবং সেটা করতে হবে ওই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়ে।

ইবলিশ ঈভের পেছনে লেগে গেল এবং আদম ও ঈভকে ওই বৃক্ষের ফল খেয়ে অমরতার প্রলোভন বিস্তার করল। বলল, তোমরা এই বৃক্ষের ফল খেয়ে অমর হয়ে যাও, এজন্য তোমাদের প্রভু তোমাদের ওই বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। এইভাবে প্রতারণা করে একদিন ইবলিশ আদম এবং ঈভকে প্রলুব্ধ করে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়ে নিজেদের সোজা-সরল পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দিল। সৃষ্টিকর্তা আদম ও ঈভকে ডেকে বললেন, তোমরা আমার আদেশ অমান্য করে মহাপাপ করেছ। এরপর তোমরা আর বেহেশতের বাগানে থাকতে পারবে না। তিনি আদম এবং ঈভকে বেহেশত থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন।

আদম এবং ঈভ পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে তাদের শ্রম, ঘাম ও দুর্ভাগ্যের উপার্জনের শস্য আহরণ করে পৃথিবীতে বাস করতে শুরু করলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ফেলে আসা স্বর্গের স্বপ্ন সুপ্ত হয়ে থাকল। এই স্বপ্ন তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেও সঞ্চারিত থাকল। মানুষ মাত্রই স্বপ্ন দেখে সে আবার স্বর্গোদ্যানে ফিরে যাবে। এই স্বপ্নের নামই হলো কবিতা।

এ জন্য মানুষ মাত্রই কবি। কঠোর বাস্তবতার মধ্যে থেকেও মানুষ ভাবে একদিন সে সুখের স্বর্গে ফিরে যাবে। এই স্বপ্ন অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই।

পৃথিবীতে কালের ঘূর্ণাবর্তে বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রযুক্তির অনেক উন্নতি হওয়ায় মানুষের বিজ্ঞান-বুদ্ধি বরাবরই কবিতাকে সরিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের জন্য আরাম ও গতি সৃষ্টি করলেও সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পনাকে, আন্দাজকে, সম্ভাবনাকে বাদ দিতে পারেনি। মানুষ সুখ পেলেই সুযোগ কল্পনা নিজের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছে। এটা তার মনুষ্যত্বের সঙ্গে জড়িত। সুখদ কল্পনাই হলো কবিতার বীজমন্ত্র। বিজ্ঞান–বুদ্ধি নিজেই প্রমাণ করেছে যে তার সব আবিষ্কারই একদা তার কল্পনা ও অগ্রিম আন্দাজের মধ্যে বসবাস করত। প্রথম আন্দাজ, তারপর আবিষ্কার। মানুষের মননশীলতায় যদি অগ্রিম আন্দাজের কোনো আভাস না পাওয়া যেতো তাহলে আমরা বলতাম এটা হলো আবিষ্কার বা উদ্ভাবন। কিন্তু মানুষ যা কিছু আবিষ্কার করেছে এর পূর্বশর্তই হলো তার আবিষ্কারের বিষয়টি তারই আন্দাজের মধ্যে আগেই উপস্থিত হয়েছিল। তার আবিষ্কার তার পূর্ব পরিকল্পনার মধ্যে সুপ্ত থাকায় তার বিজ্ঞান–বুদ্ধি সেটা খুঁজে পেতে বাস্তবে পরিণত করেছে।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার, দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা তার কল্পনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তার কবিতাকে অলংকৃত করে। একজন কবি মানুষ তার স্মৃতির ওপর ভাসমান নানা অতীতকে, অভিজ্ঞতাকে নাম ও নিসর্গকে একযোগে এক ঝলকে দেখতে শুরু করে যখন সে কবিতা লেখে। এর জন্য তাকে শব্দ হাতড়াতে হয় এবং সে পেয়ে যায়। খুব বেশি হাতড়াতে হয় না। সহজেই ইচ্ছে পূরণের মতো শব্দটি এসে হাজির হয়ে যায়। এখানে বলে রাখা ভালো যে, শব্দ চিত্রকল্পের কাজ করে। আর আমার বর্তমান ধারণা হলো, চিত্রকল্পই কবিতা।

মানুষের সব অভিজ্ঞতাই হলো প্রকৃতি ও পরিবেশনির্ভর। যা কিছু দেখি সেটাই শব্দ হয়ে গন্ধ হয়ে স্মৃতির ওপর ঘুরেফিরে বেড়াতে থাকে। এ জন্য কবি ভাষার শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চয় করতে থাকে। কবি বহুভাষী হতে পারেন কিন্তু তিনি সার্থকতা অন্বেষণ করেন নিজের মাতৃভাষায়। যেহেতু এ ভাষা আজন্ম লালিত ও ভাবপ্রকাশে সহজতা এনে দেয়।

কী অবস্থায় কবি কাজ রচনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন তা এক কথায় বর্ণনা করা অসম্ভব। দেখা যায়, অনেক সময় পরিবেশ কবির জন্য সহনীয় না থাকলেও তিনি একটি অমর কাব্য সৃষ্টিতে পারঙ্গম হয়েছেন। আবার কোনো গোলযোগহীন শান্ত পরিবেশে তিনি শেষ পর্যন্ত একটি কাব্য রচনায় সক্ষম হন না। প্রকৃতপক্ষে কাব্য রচনার কোনো সুন্দর পরিবেশের পূর্বশর্ত থাকে না। একটি শব্দ হঠাৎ কবির মনে উদিত হলে তিনি যখন লিখতে বসে যান তখন তার চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত তাকে অমর পঙ্ক্তি রচনায় সক্ষম করে তোলে। আবার শত চেষ্টা করেও কবিতার সব উপাদান মস্তিষ্কে জড়ো হওয়া সত্ত্বেও রচনাটি বাস্তব রূপ লাভ করে না, কবিকে অপেক্ষায় থাকতে হয়। পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় এবং দশটি দরকারি কাজ মূলতবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখে লিখতে বসতে হয়। এমনও দেখা গেছে যে, রাতে কয়েকটি লাইন এসেছিল শুয়ে শুয়ে, কিন্তু বিছানার আলসেমি ত্যাগ করে কষ্ট স্বীকার করে কবি উঠলেন না। ভাবলেন সকালে লিখব। কিন্তু সেই সকাল তার জন্য নিয়ে আসে বিস্মৃতি, অর্থাৎ রাতের পঙ্ক্তিগুলো সকালে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। সে বিগত রাতের সঙ্গেই স্বপ্নের মতো হারিয়ে যায়।

এজন্যই কবিকে সবসময় অলসতা ত্যাগ করে বাতি জালিয়ে টেবিলে উপুড় হয়ে স্বপ্নকে অক্ষরে রূপান্তরিত করার পরিশ্রম মেনে নিতে হয়। কবি ভোরের জন্য অপেক্ষ করতে পারেন না। রাতের কাজ রাতেই শেষ করার কষ্ট স্বীকার করে নেওয়ার নামই কবিত্ব শক্তি।

অনেক সময় কোনো এক মহাভাব কবিকে স্বস্তি দিতে চায় না। হয়তো ওই মহাভাব সম্পর্কে কোনো মহাকাব্যের উপাদান কবির মনে সতত সজ্জিত হয়ে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি কষ্ট স্বীকার করতে অসম্মত হওয়ায় সেই মহাভাব সম্পদ কবির মন ও মস্তিষ্কে বিদীর্ণ হয়ে সব এলোমেলো করে দিয়েছে। মহাকাব্যটি হয়েছে কয়েকটি ক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত। যেটাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- অভাব্য দুর্ঘটনা।

কবিকে এমন সব মুহূর্তের ভেতর দিয়ে চেতনাকে সজাগ রেখে চলতে হয় তা একটু বাধা পেলেই চৈতন্যের সীমানার বাইরে আড়াল হয়ে যায়।

এ এক আলো-ছায়ার খেলা। সদা সতর্ক রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারাদার সৈনিকের মতোই কবিকে কলম নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয়। সীমান্ত সৈনিক যেমন তার সশস্ত্র অবস্থায় সজাগ থাকেন, কবিকে তার লেখনী নিয়ে তেমনি সদা সতর্ক হয়ে চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষা করতে হয়।

কবিতাকে বলা হয় আলস্যের শস্য। কিন্তু কবিতা হলো মূলত অত্যন্ত যত্নশীল পরিশ্রমী কৃষাণের শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রের মতো। কঠোর সতর্কতা এবং যত্ন ছাড়া কবিতার শস্য গোলায় তোলা যায় না।

মনে রাখতে হবে কবিকে কেউ ক্ষমা করে না। না পাঠক, না সমালোচক। আমি অবশ্য কবিতার সমালোচনায় অবিশ্বাসী মানুষ। আমি মনে করি কাব্যের কোনো ক্রিটিক থাকবে না। শুধু অ্যাপ্রিসিয়েশন বা সমর্থন থাকতে পারে। কিন্তু ক্রিটিক কদাপি নয়। কারণ কবির প্রতি মুহূর্তের জীবন যৌনতা ও জাগতিক দশটি কাজকে বর্ণনা না করে কবিতার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। আমাদের দেশে আমার জীবৎকালে কোনো কাব্য সমালোচক খুঁজে পাইনি, যিনি কবি ও কবিতাকে মোথিত করে কোনো একটি গ্রন্থ রচনায় সক্ষম হয়েছেন।

সাহিত্যে সুবিচারের কথা অনেকেই বলেন। কিন্তু যারা বলেন তাদের অধিকাংশই হলো কবিতার শত্রু। কবিতা হলো এমন এক কাজ যার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলনীয় নয় মানুষের অন্য কোনো শিল্প। না সঙ্গীত, না চিত্রকলা। শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কবি দৃশ্যের পটভূমি বদলে দিতে পারেন কিন্তু চারুকলা শিল্পী যেহেতু শব্দনির্ভর নন, রংনির্ভর সে কারণে তিনি চিত্রকল্প নির্মাণ করতে গেলে সেটা এঁকে দেখাতে হয়। আর রঙকে শব্দের মতো অনুবাদ করতে হয় না। সঙ্গীতও আসলে ঐকতানের জন্য সহায়ক শক্তির সহায়তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু কবি যখন হরিণ শব্দটি উচ্চারণ করেন তখন শ্রোতা বা দর্শকের সামনে মুহূর্তের মধ্যে একটা চিতল হরিণ এসে দ্রুতগতিতে উপস্থিত হয়েই মিলিয়ে যায়।

মানবিক শিল্প হিসেবে আর কোনো শিল্পই কাব্যের সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না। একমাত্র কবিতা ছাড়া মানুষের আর সব সৃজনরীতি চর্চায় অনুশীলনে কঠোর পরিশ্রমে আয়ত্ত করা সম্ভব, কিন্তু কবিতা রচনাকারী দৈবাৎ কোনো মাতৃগর্ভে প্রোথিত হয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাসে আবির্ভূত হন। কোথাও তিনি কোনো দ্বীপ দেশের স্রোতস্বিনী নদীর পাড়ে খড়ের ঘরে বেড়ে উঠতে থাকেন। কোথাও আবার কোনো মরুভূমিতে মরূদ্যানে যাযাবরের মতো জন্ম বৈচিত্র্যে অভির্ভূত হয়ে বেড়ে ওঠেন।

যেখানেই তিনি জন্মান না কেন কবির একটি দেশের প্রয়োজন হয়। একজন কবির একটি দেশ ছাড়া চলে না। সেই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ হরিৎশ্যামলিমায় কবিকে বাড়তে সুযোগ দিতে পারে, আবার কোনো মুরুভূমির ধূসরতায় তার জীবনকে রুক্ষ ও রূঢ় বাস্তবতার অভিজ্ঞতা দিতে পারে। কবির একটি দেশ না হলে চলে না। অবশ্যই তার একটি ভাষা বা বাক্যস্ফূর্তির বা উচ্চারণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। দেখা যায় যে, কবি যিনি তিনি জীবনের টালমাটাল অবস্থাতেও একটি ভাষাকে আয়ত্ত করে নিয়েছেন, যেটা হবে তার মাতৃভাষা। অবশ্য আমার বিবেচনায় কবিতাই হলো মানবজাতির আদি মাতৃভাষা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

এত কথার পরও এ প্রশ্ন তো ফিরে আসবেই এই মহার্ঘ বিষয় অর্থাৎ কবিতা মানবজাতির কী উপকারে লাগে। এর স্পষ্ট কোনো জবাব কোনো কবিই দেননি। দেননি কারণ কবিতা হলো অনপকারী কর্ম। আসলে সে কারো কোনো উপকারে লাগে কি-না তার চেয়ে বড় কথা হলো এ শিল্প কারো কোনো অপকার তো সাধন করে না। এখানেই হলো কবিতার মূল সত্য সংগুপ্ত। মানুষের স্বপ্নের যেমন বস্তুনিষ্ঠ কোনো ব্যাখ্যা থাকে না তেমনি কবিতারও কোনো ব্যাখ্যা নেই। পাঠ্যপুস্তকে যারা কবিতা ব্যবহার করেন তার একটা ব্যাখ্যাও দিতে চেষ্টা করেন বটে। আসলে এসব ব্যাখ্যা ছাত্রদের একটু আধটু কাজে লাগলেও কবির কোনো সমর্থন এসব ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় না।

কবির দুটি চোখই হলো প্রকৃতিকে দেখার একটি স্বাভাবিক উপায়। দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা কবির দৃষ্টিশক্তি কবিকে দিয়ে থাকেন। রঙবৈচিত্র্য প্রথম চোখের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছে। কিন্তু দেখাই সবটা নয়। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনের ইন্দ্রিয়গুলো যেমন কোনো জিনিসের প্রাণ অর্থাৎ গন্ধ এবং স্বাদ গ্রহণের দারুণ আকাঙ্ক্ষা কবির মধ্যে সঞ্চার করে আঘ্রাণ শক্তি। যেন পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দৃশ্যমান জগতকে কবি ভোগ করতে চান। শুরু হয় সম্ভোগের বাসনা। এভাবেই সব ইন্দ্রিয় কবিকে এক অভিভূত অবস্থায় অভিজ্ঞতার ভরপুর পাত্রের দিকে টেনে আনে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো কবিকে কাব্য রচনার জন্য একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার দ্বারস্থ হতে হয়। এমন ভাষা যা সে জন্ম থেকে আয়ত্ত করে এসেছে। অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে শব্দে এবং বাক্যে। এজন্যই কবিকে আজন্ম একটি ভাষার সম্ভবপর সমস্ত শব্দ, মিল এবং একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের তুলনা শিখে নিতে হয়। তুলনা মানে হলো উপমা। এই উপমা প্রয়োগের অভ্যেস কবিকে চিত্রকল্প নির্মাণে সহায়তা করে। আসলে কবিতা হলো শব্দের দ্বারা কারো মধ্যে চিত্রকল্পের ধারণা সৃষ্টি করা মাত্র।

বিশেষ কোনো নারীর প্রতি কবির আকর্ষণের প্রধান কারণ হলো নারীর মধ্যে কবি এই পৃথিবীর প্রকৃতির দৃশ্যনিচয়ের প্রতিরূপ দেখতে পান। ফলে প্রেমে-অপ্রেমে নারী হয়ে ওঠে কবির প্রধান বিষয়। নারী রহস্য কবির কাছে এক অফুরন্ত ভান্ডারের মতো।

আমি সবসময় বলে এসেছি, মানুষমাত্রই কবি। শুধু বেছে বেছে কেউ কেউ কবি এ কথা মানা যায় না। কেউ কেউ লেখেন। কেউ কেউ লেখেন না। যিনি লেখেন তাকেই আমরা কবি বলি। কিন্তু অনেক কবি আছেন যারা লেখেন না কিন্তু তাদের কবিত্ব শক্তি বিকশিত হয় জাগতিক দশটা কাজের মধ্যে। দেখা যায় যে, তিনি সাধারণ মানুষের চাইতে একটু বেশি ক্ষমতাপ্রবণ। আমরা এসব ধরনের মানুষকে ভালোমানুষ বলি। এই ভালো মানুষরা আসলে কবি মানুষ। যারা অক্ষরে পঙ্‌ক্তি রচনা করেন না। কিন্তু সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হন। এই ভাবে কবিত্বশক্তি মনুষ্যত্ব শক্তিতে বিবর্তিত হয়ে যায়।

আমি কবিতার সমালোচনা সম্ভব বলে ভাবি না। যেসব একাডেমিক সমালোচনাকে আমরা কবিতার সমালোচনা হিসেবে গণ্য করি আসলে তা কবির কিছু শব্দ, মিল, উপমা, উৎপ্রেক্ষার বিশ্লেষণ মাত্র। একে আর যাই বলা যাক কবিতার সমালোচনা বলা একেবারেই অনুচিত। কবিতার সমালোচনা কবির পক্ষে যেমন সম্ভব নয় তেমনি কোনো অধ্যাপকের পক্ষেও সম্ভব নয়। কবিতা স্কুল– কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত হলে এর চর্চা বাড়ে বটে কিন্তু এর কোনো নতুন গুণ বর্তায় না। তবে এতে কবির পরিচিতি বাড়ে। সমাজে তিনি কল্কে পেতে থাকেন।

যেখানে কবিকে অন্তরালে রেখে কিংবা একেবারে বাদ দিয়ে শুধু কবিতাটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুরু হয় সেখানে ছাত্রদের মাথা ভর্তি থাকে ভুল অর্থ ও কেবল শব্দার্থের গজগজানি। যেমন তৃষ্ণা শব্দের অর্থ হলো পিপাসা। অথচ কবি যখন তৃষ্ণা শব্দটি ব্যবহার করেন তখন এর অর্থ কিছুতেই পিপাসা হতে পারে না, তৃষ্ণা একটি বুকফাটা শব্দ। কবি যদি সেটা ব্যবহার করে থাকেন তাহলে এর অর্থ তৃষ্ণাই থেকে যায়। পিপাসা হয় না।

এ জন্যই আমি সবসময় বলে এসেছি কাব্য সমালোচনায় কবির একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্ত জীবনীর উপস্থাপন দরকার। কবির জীবন বিশ্লেষণ, তার বিচরণ ক্ষেত্রের পরিধি, তার প্রেম, কাম, সু-অভ্যাস, কু-অভ্যাস আসঙ্গলিপ্সার বিবরণসহ তার একটি কবিতার চিত্রকল্পগুলো আলোচনায় আসতে পারে। কবির জীবন ছাড়া কাব্য সমালোচনা এ যুগে আর গ্রাহ্য করা যায় না।

তাছাড়া কবিতা অন্য কোনো শিল্প পদ্ধতি বা আর্টের পরিপূরক নয়। কবিতা একক উদ্ভাবনের শস্য। একক আবিষ্কার, এর কোনো সহোদরা নেই। চিত্রকলা বা সঙ্গীত কাব্যের সমকক্ষ নয়। কারণ কোনো বিষয়কে উত্থাপন করতে হলে চিত্রকলা শিল্পীরা বিষয়টিকে এঁকে রঙ মিশিয়ে আলো ছায়ার ভারসাম্য সৃষ্টি করে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন। সঙ্গীতও ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টিতে অন্যের মুখাপেক্ষী। এভাবে একটি কম্পোজিশনের মাধ্যমে সঙ্গীত এবং চিত্রকলার রস উপভোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু কবিতা যিনি উত্থাপন করেন তিনি শুধু শব্দের দ্বারা চিত্রকল্প নির্মাণ করে তার উত্থাপিত বিষয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন। এবং তার পারঙ্গমতা তার সমস্ত সত্তায় এক ধরনের পরিতৃপ্তির আনন্দ-আবিষ্কারের আনন্দ এবং বাক্যস্ফূর্তির আনন্দ সম্মিলিতভাবে রচনাকারীকে উৎফুল্ল করে চরম আনন্দের আস্বাদন দান করে।

কবি যখন কোনো নারীর কথা উপমায় উৎপ্রেক্ষায় পল্লবিত করেন তখন মেয়েটি রূপ-গুণ যাই হোক সে এমনভাবে পাঠকের আগ্রহ, লালসা এবং বাসনার পরিতৃপ্তিতে সংস্থাপিত হয়ে যায় যে সে আর সাধারণ একটি মেয়ে মাত্র থাকে না। হয়তো সে পরীটরি কিছুই নয় কিন্তু কবি তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তাকে তার দেহ সুষমাকে অমরতায় অভিষিক্ত করে চিরকালীন নারিত্বের প্রমাণ হিসেবে স্থিরিকৃত করেন। মেয়েটির প্রকৃতপক্ষে আর মৃত্যু ঘটে না। এক হাজার বছর পরেও যদি কোনো পাঠক কবির ওই নারী চিত্রটি ছন্দের মাধুর্যে এবং উপমার নানা উপস্থাপনায় অধ্যয়ন করেন তাহলে হাজার বছরের অন্ধকার অতিক্রম করে সে নারী– মাধুর্য পাঠকের উপভোগ্য হয়। যখন অন্য কোনো নারী সমসাময়িককালের বিবর্তনের মধ্যে দাঁড়িয়েও সেই নারী চিত্রটি অধ্যয়ন করেন তখন ঈর্ষায় তার বুক ফেটে যায়। সে নিজকে আর ধরে রাখতে পারে না। এখানেই কবি তার জাদুকরি শক্তির প্রমাণ এনে দাঁড় করিয়ে দেন। এটা কবিতাই পারে। হয়তোবা চিত্রকলাও পারে কিন্তু কবিতার মতো নয়।

অনেকেই কবিতার আঙ্গিক নিয়ে কথা বলতে চেয়েছেন। আমার ধারণা, কবিতার কোনো চিরস্থায়ী স্থির আঙ্গিক কখনো ছিল না। বিষয়ের আটপৌরে স্বভাব কিছুকাল একটি আঙ্গিকের রূপ ধারণ করে কবির মনে এর ব্যতিক্রমধর্মী কোনো বক্তব্য বা বিষয় এসে হাজির হলেই আঙ্গিকটি বদলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে থাকে। কথা হলো, মানুষের ভাষা যেভাবেই লিখিত হোক যখন তা কবি লিখেন তখন এর একটি দৃশ্যমান চেহারা খাড়া হয়ে যায়। আমরা সম্ভবত একেই আঙ্গিক বলি। প্রাচীনেরা একটি ছন্দের নিয়মের মধ্যে বাস করে সুখ পেয়েছেন। এটা প্রকৃতপক্ষে কবিতাকে এক ধরনের নিয়মের অধীন করতে চেয়েছে। যারা এটা মানেননি তাদের হাতেই কাব্যের বিবর্তন ঘটেছে। বক্তব্যের ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেছে প্রচলিত আঙ্গিক বা চেহারাটি।

সাম্প্রতিককালে আমাদের কবিতায় যে দৃশ্যমান চেহারা আমি প্রায়শই দৈনিক পত্রিকায় দেখতে পাই সেটা হলো পুনঃপৌনিকতায় ভরপুর এক ধরনের গদ্য ভাষা। অধিকাংশ কবিরই ছন্দের কোনো সিদ্ধি নেই। এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো মিল জানেন, সম্ভবপর মিল তো দেন কিন্তু বক্তব্যের বা বিষয়ের কোনো নতুনত্ব না থাকায় এর মধ্যে কবিতার রস সঞ্চার সম্ভব হয় না। এরা শুধু প্রেমের কবিতাই লিখতে আগ্রহী। যেন বাংলা কবিতার আর কোনো বিষয় থাকতে পারে না।

'তুমি' একটা বিষয় বটে। কিন্তু হাজার কবির 'তুমি' উচ্চারণ শুনে আমার মধ্যে একালের কবিদের প্রিয়তমার প্রতি বিবমিষা সৃষ্টি হয়।

এটা হলো অবক্ষয়ের লক্ষণ। যখন একটা আধুনিক কাব্যভাষার শব্দরাজি ব্যবহৃত হতে হতে জরাজীর্ণ ও দুর্গন্ধময় হয়ে ওঠে তখন এর হাত থেকে কবিদের পরিত্রাণের পন্থা উদ্ভাবন করা উচিত।

মেঘদূত লেখার সময় কালিদাস তৎকালীন উর্বশী রম্ভাদের বাদ দিয়ে এমনকি আর্য সুন্দরীদের অঙ্গসৌষ্ঠব, অবলম্বন না করে অবলম্বন করেছিলেন এক যক্ষ নারীর লাবণ্যকে। সেই যক্ষ নারী তম্বি শ্যামা এবং গুরুভার নিতম্বের অধিকারিণী।

যক্ষ কী? সেমেটিক জাতিগুলোর জিনের মেয়ের কথাই সহসা মনে পড়ে। যাহোক এই যক্ষ নারী কুর্চিফুল দ্বারা মেঘের অর্চনা করে মেঘকে তার বন্দি স্বামীর কাছে তার দুঃখের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আকুল মিনতি জানাচ্ছে। এই মর্মস্পর্শী বর্ণনার মধ্যেও কালিদাস তার অসাধারণ পান্ডিত্য, ভৌগোলিক জ্ঞান, এই উপমহাদেশের পশুপাখি, জীবজন্তু, লতাগুল্মের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক শোভা এবং সৌন্দর্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ কবি প্রতিভা। ফলে মেঘদূত হয়ে উঠেছিল জগতের সমস্ত মানব-মানবীর সুখপাঠ্য গ্রন্থ।

কবিদের সার্থকতায় পৌঁছতে হলে যে বিপুল জ্ঞান ভান্ডার এবং নৈসর্গিক পরিবেশে বিষয়াদি অধ্যয়ন করতে হয় তার প্রমাণ মেঘদূতে রয়ে গেছে। অথচ কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলমসহ আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ওইসব গ্রন্থে নিশ্চয়ই তার সমসাময়িককালে খুবই মূল্যবান সৃষ্টি হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঠিত হয়েছে। কিন্তু মেঘদূত হলো পুরোটাই স্বপ্ননির্ভর বিরহের কাহিনী। এই বই হয়ে ওঠে চিরকালীন কাব্য ভাষায় রচিত নারীর আকুতিরূপে। এখানেই কবিতা এবং জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করে সাহিত্য সৃষ্টি করার পার্থক্যটি উপলব্ধি করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এজন্যই কালিদাসকে ঈর্ষা করতেন। বলতেন 'কালিদাস তো নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে'।

সাহিত্যে বেঁচে থাকার একটা সুখ আছে বটে। কিন্তু সৃজনশীলতা কবির বেঁচে থাকার খুশি এবং দীর্ঘ আয়ুকে পরিপূর্ণভাবে সহায়তা না দিলে শুধু বেঁচে যাওয়ার মধ্যে কবি জীবনের সার্থকতার স্বাদ পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষ কবিকে একজন ছন্নছাড়া উদাসীন পাগল হিসেবে গণ্য করে সুখ পায়। অথচ কবির চেয়ে সতর্ক মানুষ সমাজে দেখা যায় না। একটি 'আ'–কার-'ই'-কার বেশ কম ও কবির কাছে অসহনীয় মনে হয়।

ভাষা চলে অঙ্কবাহিত নিয়মে। এই নিয়ম কবির মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে গণনা করা হয়। কাজটি চলে সন্তর্পণে কিন্তু বেহিসাবি মানুষ কাব্য রচনায় সক্ষম হন না। এ জন্যই কবি মূলত ভাষার স্রষ্টা। আর কোনো প্রাণীর ভাষা নেই। আছে চিৎকার, গর্জন ও আর্তনাদ। এর কোনোটাকে আমরা ভাষা বলতে পারি না। একমাত্র কবিদের কাছে আছে অসাধারণ এক রক্ষাকবচ। যার নাম কবিতা। অর্থাৎ ভাষা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

কবিমাত্রই অমরতার স্বাদ আস্বাদন করতে চেয়েছেন। তারা জানতেন মানুষের আয়ু সীমাহীন নয়। অথচ কবির আকাঙ্ক্ষা অপরিসীম। এ আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশায় তারা এমন পঙ্ক্তি উচ্চারণ করেছেন যাতে তাদের ধমনির ধ্বনি আমরা শুনতে পাই। বাসনার তাড়না শব্দে-গন্ধে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে তাদের রচনায়। এমনকি বাংলা কবিতার উষাকালে বৌদ্ধ দোহাকাররা যেসব চর্যাপদ রচনা করেছেন তাতেও আলো-আঁধারির ভাষার মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে এই আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ নিজের একটি পঙ্ক্তি বা চরণ তার রচয়িতাকে পেছনে রেখে অনন্তকালের দিকে পাখা মেলে দেওয়ার বাসনা।

এখন কবিদের এই অমরতার বাসনা নিয়ে একটু আলোচনা দরকার। কবি যখন কোনো একটি বৃক্ষের নাম উচ্চারণ করেন এবং তার ডালপালা ও কাণ্ডের বর্ণনা দিতে থাকেন তখন ওই গাছটি আর সাধারণ গাছ থাকে না। হয়ে ওঠে মায়াবৃক্ষ। কবির দৃষ্টিতে একটি পার্থিব বিষয়বস্তু ছন্দের ব্যঞ্জনা নিয়ে পাঠকের সামনে হাজির হলে তা যে শুধু বাস্তবতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তা নয়। সে স্বপ্ন কল্পনারও সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। কথা হলো, কবির হাতে সেই জাদু তার স্রষ্টা তাকে দিয়েছেন যা অন্যের করতলে সম্ভবপর হয় না। আমি অবশ্য স্বীকার করি যে চর্চা সাধনা এবং পরিশ্রমে অসাধ্য সাধন হয়। কিন্তু কাজ স্বতঃস্ফূর্তি পায় কেবল কবিরই করতলে।

অমরতা বলতে এখানে কবির কিছু শব্দ- ছন্দ- উপমার অনন্তকালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে যাত্রা বুঝিয়েছি। চর্যাপদের কাল থেকেই কবিরা জানতেন, যে শব্দ তারা ব্যবহার করে পাঠককে ইঙ্গিত দিচ্ছেন সে অর্থ তাদের নির্বাচিত শব্দটির মধ্যে আধো আধো থাকলেও পূর্ণরূপে নেই। অর্থাৎ কবি যা ইঙ্গিত করেছেন সেটা বুঝতে পাঠককেও কবির মানসিকতাটি রচনার সময় কী ছিল তা আন্দাজ করে নিতে হবে। এই ইঙ্গিতময়তা কবিতার একটি নিজস্ব গুণ। কবিতা ছাড়া গদ্য ভাষার ওপর তা বর্তায় না। অবশ্য চর্যাপদের কালে বাংলায় কোনো লিখিত গদ্যরীতির সন্ধান আজো পাওয়া যায় না। তবে মুখফিরতি একটি গদ্যরীতি যে অবশ্যই ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অমরতা হলো কবির উদ্ভাসিত কোনো দৃশ্যকল্প, কোনো নারীর শরীর কিংবা প্রকৃতির অসাধারণ বর্ণনা মাত্র। যা কাল থেকে কালান্তরে প্রশংসিত হয়ে আরো ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তবে অধিকাংশ কবি বিষয়বস্তু হিসেবে নারীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিংবা সৃষ্টির কারণ যে, মহান সৃষ্টিকর্তা এটিও কবিদের কাব্যে রহস্য সৃষ্টির বিষয় হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে। আর যারা ছিলেন বস্তুবাদী এবং বস্তু রহস্যের কূলকিনারা না পেয়ে ছিলেন ঘোর নাস্তিক তাদেরও চিন্তার বিষয় ছিল এই শূন্যতা নিয়ে। কথা হলো, কবিরা যখন কোনো বিষয়ের বর্ণনা ছন্দে-গন্ধে ভরপুর করে তুলতে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তখনই তাতে সূচিত হয়েছে অবিমিশ্র পুলক। যার অন্য নাম আমরা দিতে পারি আনন্দ। এই আনন্দের শিহরণ কবিকে এনে দিয়েছে পঙ্‌ক্তি রচনার পরিতৃপ্তি। আমার মনে হয়েছে, এই পরিতৃপ্তির স্বাদই হলো অমরতার আস্বাদন।

আধুনিক কালে মহাকাব্য বড় একটা রচিত হয়নি। যদিও আধুনিক বাংলা কবিতার সুচনা হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্য দিয়েই।

রবীন্দ্রনাথ এদিকে অগ্রসর হননি। মনে হয় বেশ সচেতনভাবেই হননি। তিনি মহাকাব্য না লেখার বিষয়ে একটা কৈফিয়ত দিয়েছেন বটে।

'আমি নাববো মহাকাব্য সংরচনে
ছিল মনে
হঠাৎ কখন তোমার কাঁকনকিংকনিতে
কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।'

মাইকেল যদিও 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে মহাকাব্যেরই উপযোগী বিষয়বস্তু উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু আধুনিকতার বিচারে তার নিজের মহাকাব্যের যুক্তিটি সঠিক ছিল না। তিনি নিজকে 'জলি ক্রিশ্চিয়ান ইয়ুথ' হিসেবে বিবেচনা করতে পুলক বোধ করলেও প্রকৃতপক্ষে তার আত্মাটি ছিল রাজনারায়ণ দত্তের মতোই হিন্দুর আত্মা। আর তিনি নিজে ছিলেন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণনার মতোই দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদনই। তিনি অশোক কাননে বন্দিনী সীতাকে জননী জাহ্নবি হিসেবে ভক্তি করতেন। তা না হলে সীতার বন্দিদশার একটা কারণ তার মহাকাব্যে নিশ্চয়ই থাকত। যুক্তিসঙ্গত কারণ, রাবণ কেন সীতাহরণ করেছিল মাইকেলের মহাকাব্যে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। এ প্রশ্ন অনেকেই করেছেন। আমারও এ ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, রাবণকে রামের চেয়েও বড় করে তোলার যে প্রয়াস মাইকেল করেছিলেন, এ ব্যাপারে আন্তরিকতা কতটুকু। কারণ মাইকেল মূলত আদি রামায়ণেরই বিশ্বস্ত প্রজা ছিলেন মাত্র। কিন্তু মহাকাব্য লিখতে হলে যেসব মহাকাব্যিক বিশ্বাস এবং বিশাল হৃদয়ের দরকার তা আদৌ মাইকেলের ছিল কি-না।

যাহোক আমি কবিদের অমরত্বের বাসনা নিয়ে ইতঃপূর্বে আলোচনার সূত্রপাত করেছি। আমার মনে হয়েছে, আধুনিক বাংলা কবিতায় যে নতুনত্বের সঞ্চার করেছিলেন ত্রিশের কবিরা সেটা একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র।

রবীন্দ্রনাথের পর আধুনিক কবিতার কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথই। ত্রিশের কবিরা নন। কারণ রবীন্দ্রনাথের একটা পরিপূর্ণ আবেগময় এবং বহুবিষয় উত্থাপন করার মতন বিষয় ছিল তার ভারতচিন্তা এবং সেটাই স্বাভাবিক ছিল। তিনি যে বলেছিলেন, 'শক হুন্দল পাঠান মুঘল একদেহে হলো লীন' এটা তো ছিল নির্জলা সত্য ভাষণ।

কবিদের অনেক সময় আপস করে বাঁচতে হয়। রবীন্দ্রনাথও আপস করেই বেঁচেছিলেন। আর যিনি এই আপসের ধার ধারতেন না তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং তাকে যে পরিণাম বরণ করে নিতে হয়েছিল সেটা তার নিজেরই নির্ধারিত নিয়তিমাত্র। যা তিনি জেনেশুনেই মেনে নিয়ে স্তব্ধবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যতদিন সরব ছিলেন ততদিন বাংলা কবিতা তার উত্থাপিত নতুন মাত্রা আত্মস্থ করতে প্রাণপণে লড়াই চালিয়েছিল। এই লড়াইয়ের মূল্য তিনি তার জাতি এবং সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পেরেছেন। এটাই হলো কাজী সাহেবের সার্থকতা। এই সার্থকতা আসলে তাকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ দিয়েছে। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা পেয়েছেন।

কবির ভাগ্য যদিও আমরা বলি কবিরাই নির্ধারণ করেন কিন্তু ঘটনাটাকে এখন আমার আর সত্য বলে প্রতীয়মান হয় না। মনে হয় কবির ভাগ্যের বিশেষ করে খ্যাতি প্রতিপত্তির নির্দেশক হলো তাঁর পাশ দিয়ে বহমান সময়ের স্রোত।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিষয়ে আমার কিছু কৌতূহল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। হতে পারে আমার এসব কৌতূহল কোনো সঠিক মূল্য বহন করে না। কৌতূহল তো কৌতূহলই।

তবু কথাটা গুছিয়ে বলতে চাই। আমার মনে হয় নজরুলের কাম-বাসনা-পরিতৃপ্ত করার মতো উপযুক্ত নারীত্বের মহিমা প্রমীলার মধ্যে ছিল না। ছিল নার্গিসের মধ্যেই। যাকে বাসরঘরে নজরুল ছেড়ে প্ররোচিত হয়ে প্রমীলাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো। নিজের সামনে তিনি প্রমীলাকে পেয়ে ক্ষুৎপিপাসা মিটিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নার্গিসকে কখনো ভুলতে পারেননি। তার স্বপ্নের চাহিদা ছিল নার্গিস আসার খানম।

এ কথাও মানতে হবে, প্রমীলা ছিলেন এক অসাধারণ মহীয়সী নারী। তিনি নজরুলের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা সম্ভবত নজরুলের প্রিয়তম অন্য কোনো নারী তাকে দিতে পারত না।

কবিতার বিষয় নির্ধারণে অনেক কবিই সারা জীবন ভুল করে গেছেন। যিনি প্রকৃতি বর্ণনায় পারঙ্গম তাকে দেখা গেছে তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে কেবল নারী বর্ণনায় জীবন ব্যয় করে গেছেন। এই বিষয় নির্ধারণ করতে গিয়ে অনেকেই সঠিক বিষয় নির্বাচন করতে না পেরে একটা আস্ত জীবন মরুভূমিতে গোলাপজল ছিটোবার পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন এবং পরে বন্ধ্যা হয়ে গেছেন।

আমি মনে করি, কবিদের নিশ্চয়ই প্রধান বিষয় হলো নারী। এই নারীকে নারী হিসেবে ও প্রিয়তমারূপে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে তাকে দেবী প্রতিমায় অর্ঘ্য দেওয়ার মতো ভ্রান্তি আর কিছুই নেই। তার চেয়ে বরং তাঁকে যদি বিশ্বাসযোগ্য মানবীর লেবাসে মানবীয় আবহাওয়ার মধ্যে সতেজ রাখার পরিশ্রম করা হতো তাহলে সেটাই হতো পাঠকদের জন্য বেশি আগ্রহের বিষয়।

কবিতা কবির অভিজ্ঞতারই স্বতন্ত্র স্বচ্ছন্দ প্রকাশ মাত্র। অনেক সময় দেখা যায় কবিতাটির বিশ্লেষণ গদ্য ভাষায় করতে গেলে এর রস কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কবিতার বিশ্লেষণ কার জন্য দরকার সেটা বুঝতে হবে। কোনো কবিতার বিশ্লেষণ কবির জন্য একান্ত দরকার নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো বিশ্লেষণে বিশ্বাসী নই। বরং কবিতাটিই আমার কাছে সামগ্রিক অর্থে একটি বিশ্লেষণ মাত্র। পাঠক হিসেবে আমি একটি কবিতাই চাই যা আমাকে মুগ্ধতায় আবিষ্ট করে রাখে। এর কোনো অর্থ চাই না বা খুঁজি না।

তবে একটি কবিতা পড়ে আমরা ওই কবিতার রচয়িতার সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করি। তার চেহারাটি চোখের ওপর ভাসতে থাকে। মনে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় তার কত আচরণ। এমনকি বদ অভ্যাসগুলো। এ জন্য আমি বলে থাকি যে, কবিকে ছাড়া অর্থাৎ কবির জীবন ছাড়া তাঁর কবিতার কোনো বিশ্লেষণ বা বিবরণ সম্ভব নয়। আমি মনে করি প্রতিটি কবিতার মধ্যে কবির জীবনের অভিজ্ঞতাই যেহেতু ব্যক্ত হয় সে কারণে কবি ছাড়া কবিতার কোনো বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া সঠিক কাজ নয়।

অনেক কবি তার বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে কবিতা করে তুলতে সফল হয়েছেন। তার কবিতাটি হয়ে উঠেছে স্রষ্টার প্রতি আত্মনিবেদনের একটি প্রার্থনামাত্র। এ ধরনের কবিরা সবসময় কবিতাকে স্রষ্টার স্তুতি বা আত্মনিবেদনের ভাষায় রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করে গেছেন। এতে কবিতায় রহস্য সৃষ্টি হয়েছে পাঠকের জন্য আস্বাদনযোগ্য এক আলো-আঁধারি। আমি নিজেও এ ধরনের স্তুতিমূলক বিষয়কে কবিতা করে তুলতে প্রয়াসী ছিলাম। কিন্তু এতে আমি সাফল্যের চেয়ে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছি বটে অথচ যাকে বলে সাফল্য তা কি আমার আয়ত্ত হয়েছে? এতে আমার সন্দেহ থেকেই গেছে। অথচ আমার সবসময় মনে হয়েছে, আমি আমার কাব্য ভাষাকে প্রার্থনার বিষয় হিসেবে পরিবর্তিত করে দিতে চাই। কিংবা মন্ত্রের মতো কিছু ক্ষুদ্র কবিতা সৃষ্টি করারও বাসনা আমার চিরকালই ছিল। আজো আছে।

হয়তো স্বভাবগত কারণে আমি যৌনগন্ধী কবিতা রচনায় বারবার ফিরে এসেছি। কারণ সম্ভবত এ ধরনের কবিতার একটি বাড়তি আগ্রহ পাঠকের মধ্যে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়। তাছাড়া ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের প্রাচীন কবিরা আসঙ্গলিপ্সাকে রসময় বর্ণনায় উত্থাপন করে পাঠকের আনন্দে ঘৃতাহুতি দিতে চেয়েছেন। যেমন শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জুলেখা'।

আমাদের প্রাচীন পুঁথিকারদের পুঁথিপত্র ঘাটলে মানতেই হবে, আমাদের প্রাচীনরা মূলত অশ্লীল রস সৃষ্টিতে তেমন কোনো দোষ দেখতে পাননি। তাঁরা লিখেছেন স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায়। লিখিত সেই সব পুঁথি পাঠ করেছেন নিজের ঘরে দাওয়ায় বসে বেশ উচ্চ স্বরে। সভার মধ্যে বসেই সভা মাত করেছেন রসের আনন্দঘন চর্চায়। পরিবারের সকলেই এমনকি নারীরাও এইসব পুঁথির রস ঘন ব্যঞ্জনের স্বাদ নিতে কোনো আপত্তি তোলেননি।

বরং কমবেশি সলজ্জ উৎসাহে পরিবারকে মাতিয়ে রেখেছেন।

জীবনের যা আছে তাই তাঁরা রসঘন পঙ্‌ক্তির মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। বেঁচে থাকার আনন্দ আমাদের প্রাচীনেরা তাঁদের কবিদের রচনা থেকে আত্মস্থ করে নিতে উৎসাহ দেখিয়েছেন। আসল কথা হলো, আমাদের জীবন যেমন এরই একটি প্রতিরূপ আমাদের প্রাচীন কবিতা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিককাল পর্যন্ত সময়কে রসসিক্ত করে রেখেছে। তবে এসব কবিতায়, পুঁথিতে,তাল পাতায়, কবিতার স্রষ্টাদের জীবনের কোনো ঘটনা আনন্দ, উল্লাস ও দুঃখ-দুর্গতির বর্ণনা পাওয়া যায় না। কেমন ছিলেন তাঁরা– আমাদের প্রাচীন কবিরা। তা আজ আর জানার উপায় নেই। তাঁদের আনন্দের ধ্বনি যেমন কালের বাতাসে মিলিয়ে গেছে তেমনি তাঁদের অশ্রুজল ও শুকনো তালপাতার ওপর শুকিয়ে রঙচটা হয়ে গেছে। আছে কেবল তাঁদের উৎকীর্ণ অক্ষর। যা অক্ষয় এবং অমর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

কবির কাছে নারী কেবল শাড়ি ঢাকা একটি রহস্যময় শরীর মাত্র নয়। এর অধিক কিছু একটা ওই রহস্যময় শাড়ির নিচে কল্পনা করে নিতে কবিরা সবসময় সচেতন থেকেছেন। প্রায় সব কবিই জানতেন আবরণে আবৃত রহস্যের বাস্তবতা কি। অথচ জানা বিষয়ের ওপর একটা পাতলা আবরণ বা আচ্ছাদন যেন কল্পনা বিনাশী কবির জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল। ব্যাপারটা অনেকটা ছাইচাপা আগুনের মতো, যা আচ্ছাদিত না থাকলে কবিকে মোহগ্রস্ত করতে পারে না। কামপ্রবণতা কবিতা নয়। অথচ বাসনার তাড়না জানা বিষয়কে কবির কাছে অজানা আকর্ষণ সৃষ্টি করে কাব্যকে সম্ভবপর করে তুলেছে। এজন্যই কবির কাছে নারী এত অর্থবহ একটি বিষয়রূপে চিরকাল গণ্য হয়ে এসেছে। যেন নারী আর শেষ হবে না। অথচ কবির স্বভাব-প্রকৃতিকেও বশ মানাতে কসুর করেনি। প্রকৃতিকে পর্যালোচনা করতে গিয়ে কবি এর হরিৎ আবরণের মধ্যে অরণ্যের অতল অন্ধকারেও হাতড়ে বেড়িয়েছেন। সেখানে দেখেছেন বন্য ফুলের সমারোহ, যার ওপর মৌমাছিরা লুটোপুটি খাচ্ছে। সেখানেও তিনি মৌমাছিদের মধু সংগ্রহের উৎসের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছেন এক সংযোগ ক্রিয়া। মৌমাছিটি মধু সংগ্রহ বা মধুর উৎসের দিকে মধু টানতে গিয়ে পুষ্পের পুংপরাগের সঙ্গে স্ত্রী পরাগের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দিচ্ছে। এতে ফুল হয়ে যাচ্ছে ফল। আসলে জগৎ রহস্যের উৎসটাই হলো ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মিলন ঘটানো।

এই ইচ্ছারই ছন্দে-গন্ধে মাত্রা গণনায় উৎকীর্ণ করে কবি কাব্য সৃষ্টি করেন। নারীকে কবি প্রকৃতি বলে সম্বোধন করতে দ্বিধা করেন না। অথচ নারী নারীই। সে গাছপালা বা নিসর্গ দৃশ্য, নদী-নালা- পর্বত নয়। নারীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে পুরুষ যিনি কবি তিনি দেখতে পেয়েছেন নদীর অতলতা, পর্বতের প্রতিরূপ বক্ষ সুষমা দেখেছেন এক অফুরন্ত গর্ভের অন্ধকার। দেখেছেন এক মহাছিদ্র। দেখেছেন আনন্দের সিংহদ্বার। একই সঙ্গে জন্মের দুয়ার। নারীর কেশ রাশিকে তার মনে হয়েছে নেবু ফুলের গন্ধে ভরা অন্ধকার গ্রাম্য পথের ঝোপ-ঝাড়ের মতো। এ রকম এক রহস্যময় লবণগন্ধি মাংসের পুতুলকে বুকে চেপে ধরতে পুরুষ মাত্রেরই প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। এটা শুধু কবির একার আকাঙ্ক্ষা নয় বরং পুরুষের আকাঙ্ক্ষা। এজন্য আমার প্রবন্ধের একেবারে শুরুতে আমি বলতে চেয়েছি মনুষ মাত্রই কবি। যদি পুরুষ কবি না হতো তাহলে এ বাস্তব জগৎ তার কাছে এক অসহনীয় নিষ্ঠুর নিরাময়হীন বাসস্থান বলে গণ্য হতো।

কবি কল্পনা জগতকে সহনীয় করেছে। সঙ্গিনীকে অপরিত্যাজ্য অপরিহার্য রূপে কল্পনা করতে শিখিয়েছে। তদুপরি পুরুষের লেলিহান বাসনার শিখাকে স্তিমিত রাখার উপায় বাতলে দিয়েছে।

এমনিতে প্রকৃতিকে হরিৎ চাদরে ঢাকা একটি অহিংস পরিবেশ বলে বিবেচনা করার অলীক আবরণ বলে মনে হলেও এর ভেতর যে হিংস্রতা পরস্পরকে ধ্বংস, গ্রাস এবং গিলে খাওয়ার অলিখিত নিয়ম রয়েছে, তা সহজে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু কবি প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করলে হিংস্রতার সঙ্গে সবুজের সমারোহ, রক্তের সঙ্গে রঙের বিন্যাস এবং জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর লড়াই দেখতে পেয়ে একই সঙ্গে ভীতত্রস্ত এবং অনাস্বাদিত আবিষ্কারের আনন্দে শিহরিত হতে থাকেন। সাপ ব্যাঙকে খেয়ে ফেলছে এতে কোনো প্রতিবাদকারী থাকতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে কোনো প্রতিবাদকারী নেই। হয়তো বন্য প্রতিরোধের নানা উপাদান ও নিয়মেরই একটি স্বাভাবিক বিষয় মাত্র।

পৃথিবীতে অনেক এমন বড় কবির নাম আমরা জানতে পেরেছি, যারা নর-নারীর প্রেম- ভালোবাসার বাইরে যা কিছু কবিতা হিসেবে লেখা হয়েছে তাকে অস্বীকার করেছেন। বলেছেন কবিতা বহির্ভূত বিষয়।

এ কথা কেন তারা এত কঠোরতার সঙ্গে সংজ্ঞায়িত করেছেন তা একটু পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

আমার মনে হয়, চিরকালই আদি কবিতার বিষয় ছিল নারীর অঙ্গশোভা। বিরামহীনভাবে কবিরা নারীর স্তুতি করে গেছেন। হয়তোবা ওইসব নারী কবির কাছে সুন্দরীতমা বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন কিন্তু অন্যরা তাকে তেমন কোনো উপমায় ভূষিত করতে পারেননি। কবির প্রিয়তমা নারীকেই অনেক সমালোচক শ্যাওড়া গাছের পেত্নী বলেও আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করেননি। অথচ তিনি তার জীবৎকালে কবি ছাড়া অন্য কারো দৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। হয়তোবা চানও নি। এতে মনে হয়, নারীরা কবির সান্নিধ্যের লাভ–লোকসান অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিসেব করতে জানতেন। ফলে জগতের অনেক অঘটনকে আমরা কেবল একজন বা একাধিক কবির স্বার্থরক্ষার জন্য লাবণ্যময় ভাষায় বর্ণনা করে গেছি। অথচ ঘটনাটি ছিল কবির স্বভাবের জন্য হয়তোবা কদর্য। এতে অতীত বা বর্তমান বলে কোনো রকমফের ঘটে না। আজও আমরা কবিকে দোষারোপ না করে কবির পারিবারিক পরিবেষ্টনীতে যারা আসা-যাওয়া করে তাদেরই খুঁটিনাটি ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাসের সমালোচনা করে মজা পাই।

সব মজারই সময় ফুরোলে তিক্ততা এসে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। তবু যে মানবজাতির বিভিন্ন ভাষার কবিদের ওপর পুষ্পের পাঁপড়ি ছড়ানো হয় সেটা হলো তিনি তার সময়কালে, সেই সময় যত দুঃসহ হোক প্রেমের কথা বলেছিলেন। আর প্রেমের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এক বা একাধিক নারী। প্রত্যেকটি নারী স্বভাব– সুন্দরী।

এখানে একটি ব্যক্তিগত বিষয় উল্লেখ করতে চাই। কোনো এক অনুষ্ঠানে আমি ও আমরা অগ্রজ কবি শামসুর রাহমান অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছিলাম। আমাদের নিতে এসেছিল একটি যুবতী। মেয়েটিকে মাঝে বসিয়ে আমরা দু'পাশে দু'জন বসেছিলাম। আমি হেসে শামসুর রাহমানকে ইঙ্গিত করলাম, 'বড় ভালো মেয়ে। অনেকক্ষণ ধরে আমার জন্য বাসায় অপেক্ষা করে আমাকে সাজগোজ করার সময় দিয়ে অনেক ধৈর্য ধারণ করে তুলে নিয়ে এসেছে।' শামসুর রাহমান অকস্মাৎ বলে উঠলেন, 'সব মেয়েই ভালো মেয়ে।' এ কথায় আমি একেবারে চমকে উঠলাম।

সব মেয়েই ভালো মেয়ে?

এর চেয়ে আদি সত্য আর কিছু নেই।

এই যে কবির বিবেচনা 'সব মেয়েই ভালো মেয়ে' এটা অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অথচ কবির ধারণা মেয়ে মাত্রই ভালো মেয়ে। কথা গুলো এজন্যই বলতে হলো যে, কবির কাছে কেন নারীই হয়ে ওঠে তার কবিতার একমাত্র বিষয়। সম্ভবত 'সব মেয়েই ভালো মেয়ে' এ দৃঢ়চেতা বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের অনন্তকালের প্রশংসাধ্বনি।

অথচ একালে এই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিপীড়িত সময়ের সংঘাতের মধ্যে মানবজাতির মহত্তর জীবন রসায়ন যে কবিতা তা যখন হলাহলে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তখন যারা ছিল ভালো মেয়ে তাদের ভালোত্ব এখন ডাইনিবৃত্তিত্বে পরিবর্তিত হয়ে গেলে আমরা কি নারীত্বকে দোষ দেব?

দোষারোপ আমার কাজ নয়। আমি সবসময় সালঙ্কারা রমণীর রহস্যের মুগ্ধ দ্রষ্টা। আমি সব বিষয়েরই দ্রষ্টা। একমাত্র কাব্যেরই আমি স্রষ্টা, যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার হাত দিয়ে রচিত হয়। আমি ছাড়া এ কাজটির আর কেউ আঞ্জাম দিতে পারে না। আরো কবি আছেন। তবে আমার কাজ আর তাদের কাজের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে।

চিন্তা-ভাবনাহীন কাব্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। কারণ কবিকে সবসময় ভেবে দেখতে হয় আমার একটি শব্দ বা একটি পূর্ণ বাক্য পাঠকের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কি দৃশ্য ফোটাবে। চিত্রকল্প আমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে কেমন করতে চাই, সেটা হুবহু পাঠকের মস্তিষ্কে নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে কি-না সেটাও যেহেতু কবিকেই ভাবতে হয়, সে কারণে কবির মধ্যে একটি সন্দেহজনক মোহগ্রস্থতা লেগেই থাকে।

যখন কবিতাটি রচিত হওয়ার পর পাঠকের কাছে গুঞ্জরিত হয়ে প্রতিধ্বনির তরঙ্গ এসে কবির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখন কবিকে যে আনন্দ দেয়, সে অলৌকিক স্বাদআস্বাদন করায় একেই বলে ব্রহ্ম স্বাদ-আস্বাদন।

কবি কাব্য সৃষ্টির মুহূর্তে যেকালে বা সময়ের তরঙ্গের মধ্যে তিনি নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচেন সেই সময়ের ব্যাপারে সদাসতর্ক থাকতে হয়। তার মনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এটা কোন কাল? এটা কোন যুগ? বাতাসে কিসের গন্ধ? প্রকৃতিতে কিসের হাহাকার? এটা কোন সভ্যতা? কোন প্রযুক্তির বলে মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছে? মানুষ কি খুঁজছে? কাকে খুঁজছে? এই মহাশূন্যতার কোনো কূল-কিনারা আছে কি? এর আরম্ভ কোথা থেকে? শেষইবা কোথায়?

কবি উত্তম রূপেই জানেন যে, প্রতিটি বিজ্ঞানের অগ্রগতি কবিতার অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। অথচ মানবজাতির মহত্তর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আগে বিজ্ঞানকে আন্দাজ করে নিতে হয়। অর্থাৎ কল্পনাপ্রবণতার মধ্যে কিছুকাল বসবাস করতে হয়। তারপর অকস্মাৎ একদিন বলে ওঠে (পেয়েছি)!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

শৈশবে আমার মাকে খানা দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করলে আমার মা বলতেন, 'তোমার এত তাড়াতাড়ি কিসের। তুমি কি রোসাংগ যাইবা?'

তখন রোসাংগ শব্দটির অর্থ বুঝতাম না। লোকপরম্পরায় হয়তো তা আমার মায়ের কাছে একটি ঐতিহ্যগত শব্দ হিসেবে উচ্চারিত হতো। পরে জেনেছিলাম এটা হলো বাংলাভাষার মহাকবি আলাওলের উদ্ভব ক্ষেত্র। আরাকান রাজসভার কবি আলাওল আরাকান রাজ্যের একজন অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে এখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ওই রাজ্যের মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে আলাওল হিন্দি ভাষার মহান কবি 'মালিক মুহাম্মদ জায়সির' 'পদুমাবৎ' বাংলায় অনুবাদ করেন 'পদ্মাবতী' নামে। তখনকার দিনে সম্ভবত আরাকান রাজ্যের রোসাংগ শহরে বাংলাভাষার একটি কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। সন্দেহ নেই আলাওল প্রচন্ড দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। সৈনিক বৃত্তি এবং কাব্যকে হৃদয়ে পোষণ করা কোনো সহজ ব্যাপার নয়।

এই প্রবন্ধে এই কথাটি উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, বাংলা ভাষার ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও তা কখনো কখনো সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হয়েছে। পরবর্তীকালে যে ধরনের মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে মহাকবি আলাওলের কথা উচ্চারণ করা উচিত ছিল তা করা হয়নি। আজ যেসব কবির দল বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছে তারুণ্যের তেজে তারা আগুয়ান হলেও বাংলাভাষার যথার্থ ইতিহাস তারা অনেকেই খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করেনি। এ ভাষার সঙ্গে জড়িত অনেক কবি ও পুঁথি লেখকের আনন্দ- বেদনা, দুঃখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও অশ্রুজল আমাদের কবিতাকে মহিমা দিয়েছে।

সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ দৃষ্টি বাংলাভাষাকে সব সময় সংকীর্ণ ধারায় প্রবাহিত করতে চাইলেও তা বারবার ফুলে ফেঁপে উঠে প্লাবন সৃষ্টি করে দুই তীর ভাসিয়ে দিয়ে এখন আমাদের কাব্য সাহিত্যকে প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে।

আমাদের দেশে এই আধুনিককালে রাজনৈতিক পক্ষপাত কবিদের কয়েকটি ক্ষুদ্র গন্ডিতে বেঁধে রাখার পণ্ডশ্রমে ক্লান্ত। এতে অবশ্য এ কালের কবিতায় কেবল বিদ্বেষের বিষ পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব ঘটিয়েছে মাত্র। তবে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবের পর এ পর্যন্ত যত কবির আবির্ভাব ঘটেছে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথই হলেন আধুনিকতর কবি প্রতিভা।

তিরিশের কবিরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কিংবা বলা যায় যুদ্ধকালীন ইউরোপীয় কাব্যধারায় বৈচিত্র্য আমদানি করতে কয়েকটা জানালা মাত্র খুলে দিয়েছিলেন। এতে আধুনিক বাংলা কবিতার শরীরে পশ্চিমের ফুরফুরে বাতাস এসে লাগলেও তা যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি। বরং রবীন্দ্রনাথ এবং কাজী নজরুল ইসলামের খরতাপে তা আবার বাঁক ঘুরে নিজের দেশ ও মানুষের মর্মবেদনার ভাষা হয়ে উঠতে চেয়েছে। ততদিনে দুই বাংলাতেই পঞ্চাশের কবির একটি স্বদেশ খুঁজে বেড়ানোর পরিক্রমায় ব্যাকুল বলে ধারণা হয়।

এই জন্যই আমি বলে থাকি যে, কবির একটি দেশ একান্ত দরকার। ত্রিশের কবিরা যা খুঁজে না পেয়ে নিজের অসম্পূর্ণতার ধারণা নিয়ে এবং আফসোস করে গত হয়েছেন।

সত্য কথা বলতে কি, পঞ্চাশের কবিরাই হলেন আধুনিক বাংলা ভাষার প্রথম বাঙালি কবি। যদিও তাদের দেশমাতৃকা তখন দু'খন্ডে বিভক্ত। তবুও দেশের ধারনা তারাই সার্থকভাবে বাংলা কবিতায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মধ্যে বাংলা ভাষার বাঁক বদল হয়ে ঢাকায় এসে উপচে পড়তে চেয়েছে। কলকাতায় এর মূর্ছমান অবস্থাটি কোনো বাঙালি কবিই সহজভাবে গ্রহণ করেননি। দেশ বিভক্ত হলে স্বপ্নের আঠা দিয়ে বাংলা ভাষাকে জোড়া লাগানোর দুঃসহ চেষ্টা ঢাকা ও কলকাতা এক মুহূর্তের জন্য ত্যাগ করেনি। যদিও কলকাতা থেকে বাংলা ভাষার আশা-আকাঙ্ক্ষা এখন প্রায় নির্বাপিতই বলা যায়।

বাংলাদেশের ওপর দিয়েও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের নির্মমতার অনেক ঘটনা অতিবাহিত হয়ে গেছে। এর সব উপাদান সাহিত্যে এখনো সঠিকভাবে উত্থাপিত হয়নি। ঘটনার দ্রুতগতি আবর্তন এবং উপাদানসমূহ থিতিয়ে দানা বাঁধলে তবেই সেটা সাহিত্যে ব্যবহার্য বিষয়রূপে আসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে।

আমাদের দেশে ঢাকায় এখনো মুক্তিযুদ্ধেরই কোনো সত্য বিষয় কেউ শিল্পমন্ডিত করে উপস্থাপন করেছেন আমি মানতে পারি না। অথচ এর দাবিদার আছে। আমি মানতে পারি না কারণ উনসত্তরের গণআন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে আমি কোনো না কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন না তারা আন্দাজের ওপর গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। আমি তা করিনি। যে ঘটনাস্রোতের মধ্যে আমি নিজে আবর্তিত হইনি তা নিয়ে কল্পকাহিনী সৃষ্টি আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি নিজেও খুব বেশী কিছু লিখিনি। তবে কয়েকটি কবিতা ছাড়াও 'উপমহাদেশ ' বলে একটি উপন্যাস আমি রচনা করেছি। যে ঘটনাকে আমি নির্জলা সত্য বলে দাবি না করলেও 'উপমহাদেশ' হলো সত্য ঘটনার একটি অফুরান কাহিনীর বিদ্যুৎচ্ছটা। আমি কবি বলে 'উপমহাদেশ'-কে খুব বেশী কল্পনাপ্রবণ ঘটনা হিসেবে উত্থাপন করতে পারিনি।

এখানে এ কথাটা এসে যায় কারণ কবিরা সত্য বলেন না, কিন্তু কেউ কবিদের মিথ্যুকও বলেন না। আমি উপমহাদেশকে আমার লেখার সবচেয়ে নিরপেক্ষ, নির্দয় ঘটনার সাক্ষ্য হিসেবে আমার পাঠকদের মেনে নিতে অনুরোধ জানাই।

যুদ্ধের সময় কেন্দ্রচ্যুত নারীদের যারা চেনেন প্রায় সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কিংবা কোনো না কোনোভাবে উচ্চ শিক্ষার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তাদেরই এক-আধজন আমার রচনায় শরীরীরূপ ধারণ করে উপন্যাসটিকে পূর্ণতা দিয়েছে। অবশ্য এটা ঠিক যে, আমি যে নারীর চরিত্রগুলো 'উপমহাদেশ'-এ সৃষ্টি করেছি তাদের সবাইকে আমি কোথাও না কোথাও মুক্তিযুদ্ধের পরে দেখেছিলাম।

আমি কখনো ভুলে যাইনি যে, কবিতা যা পারে কবির গদ্যশক্তি যত প্রবলই হোক গদ্যে তা কদাচ সম্ভবপর হয়। আমার কথা হলো আমি কবিতায় যা সম্ভবপর করে তুলেছি, আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও গদ্যে তা পারিনি।

কবিতার ইঙ্গিতময়তা, নারী এবং পরিবেশের বর্ণনা এমনভাবে কবি উত্থাপন করেন যা অতি বড় সমালোচককেও হিসাব করে আলোচনা করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে কবিতার কোনো সমালোচনায়ই আমি বিশ্বাস করি না। আগেও এ কথা আমি অকপটে বলতে দ্বিধা করিনি। এতে আমার ক্ষতির সম্ভাবনা আমি খতিয়ে দেখিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রকৃতির স্বরূপ উদঘাটন করতে অনেক বড় কবিই চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু আমার নিজের ধারণা, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রূপ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের মতো আর কেউ তেমন সার্থকতায় পৌঁছতে পারেননি। এখানে জীবনানন্দ দাশের কথা এসে যায়। তিনিও নিসর্গচিত্র বর্ণনায় তার ব্যাকুলতা দেখিয়েছেন। কিন্তু একটু পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, তার এই অভ্যেসটি ছিল ইউরোপীয় কবিদের কাছ থেকে ধার করা। সোনালি ডানার চিল, রোগা শালিক এবং ধানসিঁড়ি নদী – এ সব কিছুরই উৎস হলো ইয়েটসের আইরিশ প্রকৃতি বর্ণনার আকর্ষণীয় পদ্ধতির প্রতিরূপ মাত্র। তা হলেও আমি এ কথা স্বীকার করি যে, বাংলা ভাষাকে লাবণ্যময় করে তোলার জন্য জীবনানন্দ দাশ চিত্ররূপময় চিত্রকল্পের এক ভান্ডার বাংলাভাষায় যুক্ত করে গেছেন। যা তার পরবর্তী প্রায় সব কবিকেই কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত ও মুগ্ধতায় আবিষ্ট করে রেখেছে।

কিন্তু এই মুগ্ধতা ও আবিষ্টতা বর্তমানে আর কোনো কবির মধ্যে আমরা দেখতে পাই না। পঞ্চাশ দশকের কবিদের মধ্যে সম্ভবত কবি শামসুর রাহমান তার প্রথম বই 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' পর্যন্ত অভ্যাসের বশে হয়তোবা ধরে রেখেছেন। কিন্তু তার দ্বিতীয় বই 'রৌদ্র করোটিতে' এসে তিনি তার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে ওঠেন। তার 'রূপালি স্নান' কবিতাটি যদিও জীবনানন্দ দাশকে স্মরণ করিয়ে দেয় তবুও এটা শামসুর রাহমানের নিজস্ব প্রতিভার গন্ধে আপ্লুত একটি অসাধারণ কবিতা হিসেবে মেনে নিতে আমার সামান্যতম দ্বিধা নেই।

আমাদের আধুনিক কবিতায় পঞ্চাশ দশকের কবিদের সবচেয়ে বড় অবদান হলো নিজ দেশমাতৃকাকে যদিও তা দ্বিখণ্ডিত, হাতড়ে বেড়ানো। এমনকি শহীদ কাদরীর মতো ইউরোপীয় কবিতার দ্বারা মোহাবিষ্ট কবিকেও একদিন সহসা 'বৃষ্টি বৃষ্টি'র মতো একটি অসামান্য কবিতা লিখে ফেলতে দেখা যায়।

শুধু কবিতায় নয়, বক্তব্যে চলাফেরায় আড্ডায় অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ দশকের কবিরা আধুনিক কবিতার এবং কবির নতুন ইমেজ সৃষ্টিতে পারঙ্গম হন। আমার ধারণা ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছেয় হোক বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার পুনরুত্থান ঘটেছে পঞ্চাশের কয়েকজন কবির রচনায় এবং জীবন চারণের বিশিষ্টতার মধ্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

এই বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের কবি শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী এবং আমার কবিতায় বেশ স্পষ্টভাবেই উচ্চারিত হয়েছিল বলেই আমার ধারণা। অন্যদিকে কলকাতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করেছিল 'কৃত্তিবাস' নামে একটি পত্রিকা। যেখানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় নতুন কণ্ঠস্বর বেজে উঠল বলে বাঙালি কাব্যরসিকদের ধারণা হয়েছিল। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মূল সুর ছিল গীতিপ্রবণ। কিন্তু তিনি অসংখ্য স্বেচ্ছাচারী গদ্যেও কবিতা লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

আমার তখন মনে হয়েছিল বক্তব্যের দিক দিয়েও সুনীলের কবিতা যতটা অর্থবহ ততটা অর্থবহ বিষয় নিয়ে কলকাতায় তার সহচররা তেমন সচেতনতা দেখাতে পারছেন না। তবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তার লিরিক্যাল ম্যাজিকের গুণে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করতে পারলেন।

এ সময় শক্তি তার পূর্ববাংলার কবিতা বলে একটি সংকলন বের করেছিলেন। এতে প্রথমেই স্থান দিয়েছিলেন আমার কবিতা এবং সংখ্যার দিক দিয়ে প্রায় আট-নয়টি কবিতা ছেপে আমাকে পশ্চিম বাংলার পাঠকদের কাছে উন্মুক্ত করে দিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি কলকাতায় প্রবাসী ছিলাম, যুদ্ধের পর বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরে এসে যখন 'গণকণ্ঠ' সম্পাদনার ভার নিয়ে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে লড়াই করছি তখন শক্তি বাবু আমাকে নিয়ে একটি অসাধারণ কবিতা রচনা করেন। তার কবিতাটি আনন্দবাজারে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয়বস্তু ছিল 'আল মাহমুদ চলে গেছে এই আক্ষেপ, জানি না কোনো ভুল ব্যবহারে কষ্ট পেয়ে চলে গেছে কি-না।'

কবিতাটি তার 'অস্ত্রের গৌরবহীন একা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত আছে। অন্যদিকে কলকাতায় যখন আমার খুবই ভক্ত ও সমর্থক জুটে গেল তখন শক্তি বাবু ঈর্ষাকাতর হয়ে আমার কবিতার ওপর একটি প্রবন্ধ লিখে আমার ভুল-ত্রুটি ধরার চেষ্টা করেছেন। এতে অবশ্য আমি কিছুই মনে করিনি। তবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার সঙ্গে তখন পর্যন্ত কবির মতো আচরণ করেছিলেন এবং আমাকে বেশ খানিকটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

একবার তিনি একটি পোস্টকার্ডে লিখেছিলেন, 'আমার প্রিয় কবিদের তালিকায় তোমার নাম আমি লিখে দিয়েছি।'

তার সঙ্গে আমার মতপার্থক্য শুধু একটাই, সেটা হলো তিনি সর্বান্তকরণে ভারতীয় আর আমি বাঙালি ছাড়া কিছুই নই। তার রচনায় মুক্তিযুদ্ধকে একটা ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন এমন কোনো দৃষ্টান্ত আমি পাইনি। আর আমি নিজে মুক্তিযোদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি আমার বই প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং প্রকাশকদের কাছ থেকে সেই দুর্দিনের দিনে আমি নয় শ' টাকা পেয়ে খানিকটা সচ্ছলতা বোধ করেছিলাম।

একটি শার্ট কিনেছিলাম বেশ ঝলমলে। যেটা পরে আমি কলেজ স্ট্রিটে কফি হাউসে আড্ডা মারতে যেতাম। তখন কলকাতায় নকশালদের যুগ চলছে। আমার শার্টের ওপর ঈর্ষাকাতর হয়ে কোনো এক লেখক লিখেছিলেন বাংলাদেশের শরণার্থী লেখকরা ভিআইপিদের মতো কাপড় পরে কফি হাউসে আড্ডা মারতে আসে। অথচ শার্টটা দামি হলেও আমার তখন ছিল একটা মাত্র শার্ট।

কত দুর্যোগ এবং দুর্ভাগ্যের মধ্যে আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। যদি কবিতা আমি না লিখতাম বা আমি নিজে কবি না হতাম তাহলে এ দীর্ঘ জীবন পাড়ি দেওয়া আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হতো না। হয়তো কেন, হতোই না। সব বিপদ থেকে, সমস্যা ও শত্রুতা থেকে এক স্বর্গীয় উদাসীনতা আমাকে আবৃত করে রাখত। আমার যে অনেক ঈর্ষাকাতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে তা আমি তুচ্ছ জ্ঞান করতাম।

নারীদের প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাদের ভালোবাসতাম আমি। কিন্তু আমার পিপাসা মেটাতো একজন মাত্র। একজন যে ঘরে থাকে। একজন যে আজো আছে। একজন যার সহ্যগুণ আমাকে বিবাগী হয়ে পথে পথে ঘুরতে বাধা দিয়েছে।

কবিতার জন্য হয়তোবা নারীর সহায়তা প্রয়োজন। অথচ এই নারীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্লেষণ না করে উপভোগ করার খেসারত দিতে হয়েছে বহু কবিকে। যারা নারীর সত্যিকার উপকারিতা সাহিত্যে সংযোজন করে গেছেন তারাই মহা মাতৃকার মর্মবেদনা নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশ্রিত করে কবিতাকে মহিমান্বিত করেছেন। আসলে 'প্রকৃতি' বলে নারীকে আহ্বানের যৌক্তিকতা এখানে বোঝা যায় । কবিতা মাঝে মধ্যে অলৌকিকতার আভাস দেয়। সাধারণ মানুষ যা চোখে দেখে না কবি অকস্মাৎ একঝলক অলৌকিক বিস্ময়ের মতো সে ঘটনাকে অবলোকন করে ফেলেন এবং একই সঙ্গে ধ্যানমগ্ন হয়ে অনির্বচনীয় ভবিষ্যতের স্বাদ-আস্বাদন করতে থাকেন।

কবিতা বিজ্ঞান নয়, বাস্তবতাও নয়। তাহলে কবিতা কী? আমার নিজের বিবেচনায় কবিতা হলো কেবলই স্বপ্ন। কখনো কখনো দুঃস্বপ্নও বটে। মানুষ জীবনের বাস্তবতার মধ্যে যখন অসহনীয় জীবন যন্ত্রণায় উপনীত হয় তখনই তাকে স্বপ্নের ভেতর হাঁটিয়ে নিয়ে চলে এক অদৃশ্য শক্তি।

কে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে? এই হাঁটা বা সফরের বর্ণনা কবিকে তার অভিজ্ঞতা হিসেবে রচনায় উপস্থাপন করার অনুপ্রেরণা দেয় সেই শক্তি, যিনি তাকে স্বপ্নের ভেতর হাঁটতে শিখিয়েছেন।

বাস্তব জগতের কত রহস্যেরই তো বিজ্ঞানীরা কূলকিনারা পাননি। কিন্তু কবির কল্পনাশক্তি সত্য হোক, মিথ্যা হোক সব কিছুরই একটা ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছে। এ ব্যাখ্যা কবিদের ব্যাখ্যা হিসেবে বা কবির কল্পনা হিসেবে আমরা উড়িয়ে দেই বটে; কিন্তু বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরে আসি সেই স্বপ্নের জগতে, যেখানে সব অসম্ভবেরই একটা কূলকিনারা আছে।

কবিতা অসম্ভবকে সম্ভবপর করে তুলতে পারে তখন যখন বাস্তবের কবিকে নিজের পরিবেশের প্রতি একেবারেই বিরূপ করে তোলে। কবি যখন ভাবেন আমি ছাড়া আর তো কেউ নেই তখন কল্পনারূপসী এসে কবির গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিয়ে হেসে উঠে বলে, এই তো আমি আছি। কে বলে তুমি নিঃসঙ্গ। আমি তোমার পাশে সব সময় চিরকালীন সঙ্গিনী হিসেবে বিরাজ করি। তুমি কানা বলে তা দেখতে পাও না। তুমি মুর্খ বলে আমাকে পড়তে পার না। তুমি অপরিণামদর্শী বলে আমার উপকারের কোনো প্রত্যুপকার দিতে চাও না। আমিই কল্পনারূপসী। আমিই কবিতা। আমিই মিল এবং ছন্দ। আমার অলঙ্কারের শব্দে তুমি সচকিত হও। তোমার সব উপমাই আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে তুমি সন্দেহ করে কবিতার ভাঁজে ভাঁজে সাজিয়ে রাখো। মৃত্যু ছাড়া আমার কাছ থেকে তোমাকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। আমি তোমার চিরকালের আশ্রয়। তোমার মা, তোমার ভগ্নি, তোমার দয়িতা এবং একই সঙ্গে তোমার আত্মধ্বংসের অগ্নি। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে জ্বালাই- পোড়াই, সোনায়- সোহাগা মিলিয়ে তোমার মধ্যে আলোকচ্ছটা বিন্যস্ত করি। আমি তোমার জন্য সতী এবং এক সঙ্গে অসতীও বটে। দেখো এখন তো গভীর রাত। বিছানা হাতড়ে দেখো তোমার পাশে কে শুয়ে আছে। তুমি তাকে কত নামে ডাকতে পার। কত নামে জপ করতে পার। জপো। কিন্তু যখনই স্পর্শ করবে দেখবে আমিই শুয়ে আছি। আমি ছাড়া তোমার আপনজন কোনোদিন কেউ ছিল না। ভবিষ্যতেও থাকবে না। যতদিন তুমি কলম ধরে লিখতে পারবে ততদিন আমি তোমার কলম। তোমার বুকের বাঁ পাশে হাত দাও, যেখানে ব্যথা ও দুঃস্বপ্ন জমে আছে। আমি হলাম তোমার সেই চিরব্যথাতুর অন্তরের মলম মাত্র। আমাকেই খাও, আমাকেই পান কর, আমাতেই কর প্রক্ষালন। আমিই মানব সন্তানদের নৈঃসঙ্গ অবসানের ওষুধ। তুমি তো কতবার আমার হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় ছিটকে বেরিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছ। আমি তোমার পেছনে ধাওয়া করেছি। তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি পাগলামি থেকে। তা না হলে তুমি তো কবির বদলে মানসিক রোগী হিসেবে পাগলাগারদের অন্ধকারে জীবন কাটাতে বাধ্য হতে। আমি তোমার চেতনে-অচেতনে হাতড়ে- হাতড়ে তোমাকে সুস্থতা দান করিনি কি? শুধু তুমি কবি বলেই যে এটা আমি করে থাকি তা নয়। আমি প্রতিটি মানব সন্তানের মধ্যেই চৈতন্য উদয়ের বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিয়ে তাকে ব্যাকুল করে রাখি।

ওরে আমার শিশু, তুমি শয়তানের সঙ্গে লড়াই করছ, জলে, স্থলে- অন্তরীক্ষে। আমি কি তোমাকে উদ্যেম জাগিয়ে এই যুদ্ধে বিজয়ী হতে সাহায্য করছি না।

আমিই মানুষ মাত্রকে তার সব বাস্তবতার ফাঁকফোকরে, ছিদ্রে, গর্তে স্বপ্ন জমা করে রাখি। শুধু বিশেষ কোনো ব্যক্তির জন্য আমি স্বপের্ন খাদ্যের জোগান ধাত্রী নই। আমি সব মানুষের জন্য মায়ের মতো, বধূর মতো, বোনের মতো স্বপ্নের খাদ্য কষ্টের মসলা মিশিয়ে রন্ধন করি। যারা আমার রান্নার আঘ্রান-আস্বাদন করে তারাই বাঁচার মর্মার্থ হৃদয়ে উপলব্ধি করে।

সে অর্থ কেউ কেউ নয়, সব মানুষই কবি। অর্থাৎ কবিত্ব ছাড়া মনুষ্যত্বের স্তম্ভ গড়া যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

সব কাজেরই সম্ভবত বিশ্রাম আছে। বিরাম আছে। ছিদ্র কিংবা ছেদ আছে। কিন্তু কবির কোনো বিশ্রাম, বিরতি বা ছেদ নেই। সে যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখনো তার মস্তিষ্ক কাজ করতে থাকে। ফলে ঘুম থেকে জেগে ওঠার মানুষের চেহারার সঙ্গে কবির চেহারার ঈষৎ পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই অর্থে সব মানুষ থেকে কবির নিদ্রা একটু আলাদা ব্যাপার। আমি আগে বলেছি যে, মানুষ মাত্রই কবি, কিন্তু যিনি কলম ধরে লেখেন, পঙ্‌ক্তি বিন্যস্ত করেন এখানে এ পার্থক্যটি মেনে নিতে আমার দ্বিধা নেই। তবে সব মানুষই যে কবি এই সিদ্ধান্ত থেকে আমাকে কেউ অন্যদিকে নিয়ে যেতে পারবে না।

এখানে আবার সেই পুরানো মায়াবিনী নারীর কথা উত্থাপন করতে হয়। একমাত্র নারীই ক্ষণকালের জন্য হলেও কবিকে বিভ্রান্ত করে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে। তবে তা শুধু ক্ষণকালের জন্য। কবির বিপদ হলো, তার মোহ যতই তাকে আচ্ছন্ন করে তেমনি সহসা তা কাটিয়ে ওঠার শক্তিও কবি নিজের মধ্যে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করতে সমর্থ। এজন্য কবিকে নারীরা অবিশ্বস্ত প্রেমিকের দলে সন্দেহের খাতায় তালিকাভুক্ত করে রাখে।

একবার একটি অল্প বয়স্ক কিশোরী যে কি-না কবি হওয়ার বাসনায় দিনরাত পত্রপত্রিকার সাহিত্যের পৃষ্ঠায় কবিতা জমা দিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়ে আমার কাছে এসেছিল, তার কথা একটু বলতে চাই। সে আমার ঘরে প্রবেশ করেই সোজাসুজি প্রশ্ন করল, আচ্ছা, ছন্দ না থাকলে কী হয়? মিলের কি প্রয়োজন?

আমি তাকে পাশের সোফাটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, 'এখানে বসো।' আমি ঘরের ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে তার পাশে বসলাম। 'ছাদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললাম, তুমি কি চাও এই ছাদটা এখনই হুড়মুড় করে তোমার মাথায় ভেঙে পড়ুক?' কবি কিশোরীটি হতবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, 'আমার মুখে কিছু নেই। এই ছাদের দিকে তাকাও, দেখ কেমন ছক মেলানো। এরই নাম ছন্দ, এটার জন্য স্থপতিরা অঙ্ক মিলিয়ে কাজ করেছেন। এই ছন্দের একটু ব্যত্যয় ঘটলে তাদের পক্ষে এই স্ট্রাকচার গড়া সম্ভব ছিল না। তারা ভরের হিসাব রেখে ইট ও সিমেন্ট ঢেলে দিয়েছেন। তাতে ভরের সমতা বিধান হয়েছে। একেই তো ছন্দ ও মিল বলে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে সবকিছু তোমার ওপর ভেঙে পড়বে, বুঝলে। কবিতার ভাষাও অঙ্কের নিয়মে চলে, মাত্রা গুনতে হয়। যদি সেটা না পারো তাহলে অন্য কাজ দেখো। অনর্থক কবি হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করো না।'

মেয়েটি মনে হয় আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। ততক্ষণে কাজের মেয়েটা আমাদের সামনে দু'কাপ চা রেখে গেল। কবি কিশোরীটি ধীরেসুস্থে ফুঁ দিতে দিতে চা-টা খেয়ে উঠে পড়তে পড়তে বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি। এবার তাহলে আসি।'

কবিতা যে অঙ্কবাহিত নিয়মে চলে এটা অল্প বয়সে অনেক তরুণ কবি বুঝতে চায় না । তারা ভাবে, তারা স্বেচ্ছাচারী গদ্যে যা কিছু রচনা করে সেটাই কবিতা। কিন্তু কবিতা চিরকালই ছন্দ ও মিলের মুখাপেক্ষী। ছন্দ উত্তমরূপে না জেনে যারা গদ্যে কবিতা সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়, তারা গদ্য ভাষাকে এলোমেলো করে দেয়। তাতে রস সঞ্চার করতে পারে না। কবি হওয়ার প্রথম শর্তই হলো, তাকে উত্তমরূপে বাংলা ভাষার প্রচলিত ছন্দে সিদ্ধহস্ত হতে হবে। এই ধরনের কবিরাই শেষ পর্যন্ত গদ্যেও রস সঞ্চার করতে সমর্থ হন। কিন্তু ছন্দ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে কারো পক্ষে কবি হওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমান বাংলা ভাষার আধুনিকতার ভার বহনকারী যে ছন্দ বেশি ব্যবহৃত হয় তার নাম অক্ষরবৃত্ত। এই অক্ষরবৃত্তে একালের সব প্রধান কবিই মোটামুটি দক্ষতা দেখিয়েছেন। এটা কবি শামসুর রাহমানেরও প্রধান ছন্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। তিনি যা কিছু লিখতেন সেটাই অক্ষরবৃত্তের চালে মাত্রা গুণে লিখতেন। ফলে বহু পুনরাবৃত্তির মধ্যেও তার কাব্য রচনার একটা সচলতা সবাই উপলব্ধি করতেন। যেহেতু আমারও প্রধান ব্যবহৃত ছন্দ বলতে গেলে অক্ষরবৃত্তেই স্ফূর্তি পেয়েছে সে কারণেই আমি এর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলাম। হয়ে উঠেছিলাম সনেট আঙ্গিকে কবিতা লিখতে বেশি মনোযোগী। যদিও আমি মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তেও প্রচুর কবিতা লিখেছি কিন্তু পরীক্ষা করে দেখেছি কবিতা লিখতে বসলে আমার কাছে বা আমার হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্ষরবৃত্ত চালই আগে চলে আসে।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া উচিত, পৃথিবীর সব বড় কবিই নিজে পারঙ্গম এমন একটা ছন্দে কাজ করে সুখ পেয়েছেন। তাদের সবরকম বড় কাব্যগ্রন্থেই এমনকি মহাকাব্যেও ছন্দ বৈচিত্র বড় একটা পরিলক্ষিত হয় না। বলার কথা, যা তা একটি মাত্র ছন্দে স্ফূর্তি পেয়েছে। আমার কাছে যারা সাক্ষাৎ করতে আসেন সেসব তরুণ কবি ও কবিনীদের আমি প্রায় সবাইকে গদ্যভঙ্গি ত্যাগ করে অক্ষরবৃত্তে দক্ষতা অর্জনের সুপারিশ করে থাকি। কারণ বাংলা ভাষার আধুনিক কালকে ব্যক্ত করতে অক্ষরবৃত্ত যতটা সহায়ক হয়েছে মাত্রাবৃত্তে তা হয়নি। যদিও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তার প্রধান আকর্ষণীয় কাব্য সৃষ্টিতে মাত্রাবৃত্তের ওপর জোর দিয়েছেন বেশি। তবে এখানে একটা কথা বলে নেওয়া উচিত যে তিনি অক্ষরবৃত্তেও সমান দক্ষ ছিলেন। অথচ জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ছন্দগত শৈথিল্য থাকায় বিলম্বিত অন্তঃমিল দিতে তাকে অনুপ্রাসের অন্তর্গত মিল খুঁজে আনন্দ সৃষ্টি করতে হয়েছে।

আমাদের অধিকাংশ তরুণ কবি প্রচলিত বাংলা ছন্দগুলোতে পারঙ্গম নয় বলেই গদ্যে কবিতা লিখতে চায়। অথচ বাংলা গদ্যেরও একটা ছন্দ আছে। একটা বহমানতা স্বতঃসিদ্ধভাবে এসে বাংলা গদ্যকে কবিতার উপযোগী করার জন্য আগুয়ান। কিন্তু ছন্দ একেবারে না জেনে গদ্যকে কবিতা করে তোলা খুবই দুরূহ ব্যাপার। আমি মিশ্রিত ছন্দে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য কিছু চেষ্টা করে গেছি। এই চেষ্টার প্রমাণস্বরূপ আমার নতুন কাব্যগ্রন্থ 'তুমি তৃষ্ণা তুমিই পিপাসার জল' প্রকাশিত হলে কাব্যরসিকদের হাতে হাতে ঘুরেছে। নিজের কাজের কৈফিয়ত দেওয়ার জন্যই আমি এ কথা বলছি না। বলছি, আমাদের আধুনিক কবিতার নিগূঢ় স্বার্থে।

অনেক তরুণ কবি ছন্দে লিখেও কাব্য সৃষ্টিতে সক্ষম হচ্ছে না। তাদের সব লেখাই ছন্দবদ্ধ আবর্জনা বলে আমার ধারণা হয়। পঙ্‌ক্তিতে কি গুণ বর্তালে পাঠকরা একে কবিতা বলে গ্রাহ্য করে তা বুঝতে হবে। অনেকেই ছন্দে লিখেও সেটা বুঝতে পারে না। পত্রপত্রিকার সাহিত্য পৃষ্ঠা দখল করে রাখলেই কেউ কবি হয় না। আমাকে যেহেতু অনবরত কথাশিল্পেও কাজ করে যেতে হয় সে জন্য কাব্য কি তা আমি সারা জীবন অনুসন্ধান করে বার্ধক্যে এসে উপনীত হয়েছি। আমি লেখালেখি ছেড়ে হাত গুটিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু আমি সেটা করিনি কেবল আমাদের দেশের কবিদের প্রেরণা দেওয়ার জন্য।

তরুণরা প্রতিদান দেয় না এ কথা জেনেও আমি তারুণ্যকে উৎসাহ এবং প্রেরণা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছি। তাছাড়া আমি কবিদের সবসময় উৎসাহ জুগিয়েছি কবিতা লেখার পাশাপাশি গদ্য লেখার অনুপ্রেরণা দিয়ে। কারণ, আধুনিকতাকে ধরতে হলে কবিকে কোনো না কোনোভাবে ফিকশন সৃষ্টিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচ্ছলতা অর্জন করতে হবে বৈকি! আজকাল প্রায়ই আমার কাছে যারা আসেন তাদের একটি আক্ষেপ শুনতে পাই। তাদের আক্ষেপ হলো, বিষয় খুঁজে পাচ্ছি না। এই অভিযোগটা ঠিক নয়। যিনি প্রকৃত কবি বা কথাশিল্পী তাকে বিষয় হাতড়াতে হয় না। আর বিষয় তো শুধু ঢাকা শহরের মধ্যে জমা নেই। তা একটা অভিজ্ঞতার মধ্যে জমা থাকে। যেভাবে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন সেখানেই আছে পুঞ্জিভূত বিষয়ের ঘনঘটা। এই অভিযোগ মেয়েরা অর্থাৎ নারী লেখকরা উত্থাপন করলে মানাত ভালো। কারণ, তাদের জীবন একরৈখিক। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য হয়তোবা একজন তরুণ লেখকের চেয়ে কম। কিন্তু মেয়েরা এই আক্ষেপ করে না। আক্ষেপটা আসে পুরুষ অর্থাৎ তরুণ কবি বা কথাসাহিত্যিকের পক্ষ থেকে বেশি।

আমি মেয়েদের অভিজ্ঞতা একরৈখিক বলে তাদের খাটো করতে চাইনি। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি তারাও তাদের জীবনের অন্যরকম যাপনকে অর্থবহ করে লিখতে সক্ষম। কেউ কেউ লিখছেনও।

আধুনিক সাহিত্যের কথা বলতে গেলে স্বভাবতঃই কবিতার চেয়ে কথাশিল্পের দিকে বেশি নজর দিতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের দেশে কথাশিল্পের চেয়ে কবিতা অর্থাৎ কবিদের নর্তন-কুর্দন একটু বেশি, দাপটও বেশি। এটা আধুনিকতার বিচারে যথার্থ বলে মনে করি না।

আমি প্রকৃতপক্ষে এই রচনায় আধুনিকতার বিচারক সেজে বসিনি। আমি যা বলতে চাই সেটা হলো সাম্প্রতিক সাহিত্যের কয়েকটা লক্ষণকে লেখকদের মধ্যে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিতে। সাম্প্রতিকতা সবসময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দোহাই দিয়ে কবিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছে। কবিতা আর যা-ই হোক বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞানের সহযাত্রী, স্বপ্নের যানবাহন মাত্র।

কবিতা না থাকলে কী হয়। কিছুই হয় না। তবুও কবিতা আছে কেন? এজন্যই আছে যে, যিনি বিজ্ঞানী তিনিও তার সবটা কাজকে বাস্তবতার মধ্যে বিন্যাস করতে পারেন না। স্বপ্নে করেন। কল্পনার মধ্যে পারেন বলে অসাধ্য সাধিত হয়। এভাবেই কবিতা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পরিক্রমার যুগেও টিকে আছে। যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন তারা স্বপ্ন দেখবে। আর স্বপ্নের বিবরণ লেখার জন্য কয়েকজন জন্মগত স্বপ্নচারী জন্মগ্রহণ করবেন। আমরা যাদের কবি বলে আখ্যায়িত করতে থাকব। এই অর্থে কবি না থাকলে মানুষের পূর্ণতা পায় না। জাতিগুলোর মধ্যে সম্ভবত এজন্যই একজন কবির প্রয়োজন কখনো ফুরায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

কবি হওয়ার প্রধান শর্তই হলো, তিনি যে ভাষার কবি সেই ভাষার প্রচলিত ছন্দ সম্পর্কে তাকে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে। তিনি গদ্যে-পদ্যে যে কোনো পদ্ধতিতে কবিতার কাজ করলেও ছন্দ সম্পর্কে তার পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে। জানতে হবে উপমা কি? অনুপ্রাস কিভাবে পঙ্‌ক্তির মধ্যে বয়ন করে অন্তমিলে পৌঁছতে হয়। ভাষার সম্ভবপর মিল তার মনে এবং মস্তিষ্কে প্রতিনিয়ত গুঞ্জরিত হলেই কেবল অলঙ্কার শাস্ত্র কাউকে কবিত্বের অদৃশ্য মুকুট পরিয়ে দেয়।

উপমা হলো বিশ্বাসযোগ্য প্রতিতুলনা মাত্র। কেনা জানে 'পাখির নীড়ের মতো' চোখ হয় না। কিন্তু কবি যখন এ উপমাটি ব্যবহার করেন তখন তা পাঠকের মনে একটা মায়াময় বিশ্বাসযোগ্য উপমা বলে তর্কাতীতভাবে স্বীকৃতি দেয়।

ছন্দ হলো সমান মাত্রায় ভাষার বহমানতা। আর মিল হলো বাক্যের শেষপ্রান্তে এসে তাল রক্ষা করা। কবি কখনো গুণে কাজ করেন না। কিন্তু তার চোখ এবং মস্তিষ্কে সর্বোপরি হৃদয়ে একটি গণনার সচকিত স্বভাব সতর্ক অবস্থায় থাকে।

কবিতার ভাষা সবসময় মাত্রা অংকবাহিত নিয়মে চলে। এ নিয়মের ধারা ব্যাহত হলেই ছন্দপতন ঘটে। আর যে কবির ছন্দে ত্রুটি ধরা পড়ে যায় তাকে পাঠক বা সমালোচক কেউই সহ্য করে না।

কবিকে সবসময় উপমার ব্যাপারে সচেতন বা সতর্ক থাকতে হয়। তবে কেউ যদি বলেন তার প্রেয়সীর মুখ চাঁদের মতো তাহলে আমাদের উপমা

প্রচলিত হাজার হাজার বছরের ধারণার মধ্যে তিনি কাজ করছেন বলে মনে হবে। কিন্তু কেউ যদি বলে, 'আমার প্রেয়সীর মুখ নতুন চরের মতো' (জসীম উদ্‌দীন) তাহলে সহস্র বছরের উপমার শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে এবং শুরু হবে নতুন দুঃসাহসিক কবিত্ব শক্তির বৈপ্লবিক উত্থাপন। যেমন : 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' (সুকান্ত)।

উপমা বা প্রতিতুলনা কবি ক্রমাগত উত্থাপন করেই অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। সেই লক্ষ্যটা হলো সুন্দরের দিকে অর্ঘ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। কবি আরো একটি কাজ একই সঙ্গে আঞ্জাম দিতে থাকেন। সেটা হলো পাঠকের মনে বাক্যের দ্বারা চিত্রকল্পের সৃষ্টি করা। কবি যা বলেন পাঠকও যেন সেই বিষয়টিকে তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করে এবং যে দৃশ্যটি কবি সঞ্চার করতে চেয়েছেন সেটি যেন মুহূর্তের মধ্যেই পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়। যে অভিজ্ঞতা থেকে কবি হরিণ শব্দটি উচ্চারণ করেন তা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক যেন সুন্দরবনের সেই চিত্রাহরিণের কল্পনাটি বাস্তবে প্রতিফলিত করে। কেউ কেউ বলেছেন– তারা সবাই এ যুগের কবি, চিত্রকল্পই হলো কবিতা। আমি নিজে অবশ্য শুধু চিত্রকল্পের মধ্যে কবিতাকে সীমাবদ্ধ করতে সম্মত নই। আমি স্বপ্নকে কবিতা বলার লোভ সামলাতে পারি না। এমন স্বপ্ন, যা ঘুমিয়েও দেখা হয় এবং জেগে থেকেও কবি দেখতে থাকেন। কথা হলো যা কিছু কবির কাম্য– প্রকৃতি, নারী ও নির্সগ সবকিছু বাস্তবতা এবং কল্পনায় অতিরঞ্জিত হয়ে কবিতায় রহস্য সৃষ্টি করবে।

নারী ও প্রকৃতি অনন্তকাল থেকে কবির দুটি প্রিয় বিষয়। এ বিষয় দুটির ওপর রহস্যের মশারি বা চাদর খানিকটা ঢেকে রেখেছে বটে, কিন্তু যেটুকু ঢাকা সেটুকু কবির কল্পনার মধ্যে অনাবৃত। তিনি নিজের মনে নিজের পিপাসা মেটানোর প্রয়াসে তাকে ইচ্ছেমতো একটু একটু করে উন্মুক্ত করেন বটে; কিন্তু সবসময় সতর্কভাবে একেবারে নগ্নতাকে প্রকাশ করতে চান না। সবকিছু অনাবৃত হয়ে গেলে কবির আর রহস্য সৃষ্টি করার শক্তি থাকে না। এই শক্তি সহজে কবি নষ্ট করে দিতে অস্বীকৃতি জানাতে থাকেন। কারণ পূর্ণ নগ্নতা কাব্য সৃষ্টির সহায়ক নয়। তাহলে তো কবি একেবারেই ফতুর হয়ে যান।

শব্দ চয়নে কবির মধ্যে এক ধরনের শিহরণ জাগে। প্রতিটি শব্দই যে আসলে একটি দৃশ্যের জন্ম দেয় এটা কবির চেয়ে বেশি কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। দেখা যায় শব্দের একটা ভান্ডার সব কবিরই মানসিক সঞ্চয়ের মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছে। যার শব্দ সঞ্চয়ন অনেক বেশি তার সার্থকতা তত সাফল্য এনে দেয়। তবে শব্দকে ধারণ করার ক্ষমতা যত বেশি বা কমই হোক, প্রত্যেক কবির মধ্যে তা সঞ্চিত আছে। এই নিয়েই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কাজ করতে হয়। শব্দের বহমানতা ও তরঙ্গকে রণরণিয়ে বা ঝনঝনিয়ে বাজানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য কবি পঙ্‌ক্তির ভেতরে অনুপ্রাসের গুঞ্জন তৈরি করে।

অনুপ্রাস হলো একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের অনুরণন তৈরি করা। যেমন-'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' (জীবনানন্দ)। এখানে 'চুল তার-এর সঙ্গে কবেকার' শব্দের অনুরণন তৈরি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এসেছে অন্ধকার এবং বিদিশার শব্দ দুটি অন্তরে ঝঙ্কার।

'তার','কার', 'শার'এই রোণিত ঝঙ্কারই হলো অনুপ্রাস। কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে এই সৌকর্যই হলো অলঙ্কার, যার নাম দেওয়া হয়েছে অনুপ্রাস।

সুকুমার রায়ের একটি শিশুতোষ কবিতায় আছে,

'রাতকানা চাঁদ ওঠে
আধখানা ভাঙা

চট করে মনে পড়ে মটকার কাছে
মাল পোয়া আধাখানা
কাল থেকে আছে।'

বাক্যের এই অভ্যন্তরীণ মিল সৃষ্টিতে সুকুমার রায় খুবই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এটা হলো বাংলার আধুনিক কবিতায় এক অসাধারণ শক্তি তরঙ্গের উপস্থাপন, যা অনুপ্রাস বা অনুরণন সৃষ্টি করে পাঠকের মনে।

বাংলা কবিতার অলঙ্কার শাস্ত্রে লৌকিক ছড়াগানের একটি প্রভাব আছে। তবে এ মুহূর্তে তা এখানে আর উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি না। তা ছাড়া হাতের কাছে উপাদানও নেই যে, প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করব। আমি প্রায়ান্ধ মানুষ। অলঙ্কার শাস্ত্রের বহু বিস্তৃত আলোচনা কেবল ধারণা থেকে উল্লেখ করার মতো স্মৃতিশক্তি আমার নেই।

আমি মূলত এ যুগের কবি। অক্ষরবৃত্তেই আমার বাক্যের ভার আমি সইয়ে বইয়ে দিতে পেরেছি তৃপ্তিকরভাবে। সনেট আঙ্গিকে কবিতায় এবং এক লাইন পরপর সহজ মিল দিয়ে আমি আমার অধিকাংশ সনেট রচনা করেছি। যারা বলেন এতে খুব বেশি বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় না, আমি তাদের কথাকে গ্রাহ্য করি না। কারণ প্রতি যুগেই বাক্যের জন্য একটা সহজ ছন্দ কবিরা আবিষ্কার করেন। আমার–কালে আমার কাছে অক্ষরবৃত্তই সেই ছন্দ, যা আমার সব কবিত্বের সারাৎসার বহন করে আমাকে কম-বেশি খ্যাতিমান করেছে। অখ্যাতিও কম জোটেনি।

অক্ষরবৃত্ত হলো বাংলা ছন্দের সবচেয়ে ভারবহনকারী চিন্তার বাহক। উপমার এবং অনুপ্রাসের কাজ করতে এ ছন্দ বহু কবিকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

লেখালেখির ব্যাপারে আমি অসতর্ক মানুষ। কিন্তু একটা বিষয় আছে–যে বিষয়ে কথা বলতে গেলে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা সতর্ক এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেটা হল কবিতা। কবিতা নিয়ে আমি কখনো হিসেব নিকেশ না করে কথা বলতে অভ্যস্ত হইনি। এমনকি কোনো সভা-সমিতিতেও দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাষণ আমি দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। আমি কবিদের সমালোচনা করি বটে কিন্তু কবির মনে মর্যাদাহানির জ্বালা সৃষ্টি হয় এমন কাজ সচরাচর করি না। তবে সমকালীন পরিস্থিতিতে কবিতার দুর্গতি অবলোকন করে এর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য হয়তবা কিছু হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছি। এতে আমার লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশি। কারণ কিছু তরুণ কবি আছেন যারা আমার সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেননি। তাতে অবশ্য বিরোধিতার মধ্যে আমি প্রতিপক্ষের কবিতা বিষয়ক ভাবনা-চিন্তার সাথে পরিচিত হতে পেরে সুখ পেয়েছি।

যদিও এই সুখানুভূতি আমার মনে কোন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেনি।

আমি সবসময় কবিতাকে ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে উদার উচ্চারণ ভঙ্গি আয়ত্তের পরামর্শ দিয়ে থাকি। এটা ভাল কি মন্দ তা খতিয়ে দেখার চেয়ে ক্ষুদ্র গন্ডিমুক্ত কবিতা রচনার প্রয়াসী হওয়ার পরামর্শ বলে ধরে নিতে হবে। আমি একবার বলেছিলাম, আধুনিক বাংলা কবিতা বাংলাদেশে অর্থাৎ ঢাকায় চরায় আটকে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এতে অনেক তরুণই ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। হয়ত তাদের প্রতিবাদ ন্যায়সংগত ছিল। কিন্তু আমার পরামর্শটা ছিল আধুনিক কবিতার গন্ডিমুক্ত হওয়ার দিকে একজন বয়োবৃদ্ধ কবির আহ্বান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্র। আমাকে ভুল বোঝা হয়েছে। কারণ আদর্শগতভাবে আমি হয়তো অনেকেরই অপছন্দনীয় কবি মানুষ।

এরপর থেকে আমি সতর্ক হয়েছি। আমি আর এখন কোনো তরুণ কবিকে পরামর্শ দিতে চাই না। নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে চেষ্টা করি মাত্র। তবে কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় আমার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল মুছে ফেলতে পারি না। ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ আমি সৃষ্টি করিনি। যারা সৃষ্টি করেছিলেন তারা তাদের রাজনৈতিক আদর্শকে বিজয়ী করতে চেয়েছিলেন। কবিতাকে নয়।

এখনতো স্তব্ধতা নেমে এসেছে। তাহলে কি কবিতা থেমে থাকবে? আমি জানি এ দেশে কয়েকজন উদ্যমশীল তরুণ কবি ক্রমাগত তাদের রচনায় বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছেন। তাদের কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়তবা আমার নেই। কিন্তু তাদের কোন রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হলে আমি তা সাধ্যমত পাঠ করতে চেষ্টা করি।

বাংলাদেশে আধুনিক কবিতার উদ্যমশীল কবিত্ব শক্তিকে সংহার করার জন্য যে গদ্য শক্তি বা কথাসাহিত্যের স্রোত পাঠকদের কাছে গ্রাহ্য করে তোলার দায়িত্ব কথা শিল্পীদের উপর বর্তায় সেটা যথেষ্ট প্রতিভাবান গল্প-উপন্যাস লেখক না থাকায় সার্থক হওয়ার সম্ভাবনা আমি দেখি না। ফলে টুকরো টুকরো হলেও কিছু তরুণ কবি নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে কবিতা লিখে চলেছেন।

তাছাড়া এদেশের সাহিত্য বিচারে আধুনিক কবিতাকেই আধুনিক সাহিত্যের মর্যাদা এতদিন দিয়ে আসা হয়েছে। অথচ অন্যান্য দেশে কথাসাহিত্য, ফিকশন ও উপন্যাসকেই আধুনিক সাহিত্যের দিক নির্দেশিকা বলে ধরে নেয়া হয়।

আমাদের দেশে এটা ঘটে গেছে। আধুনিক কবিরাই আধুনিকতার মুকুট মস্তকে ধারণ করে বিরাজমান আছে। আমি নিজে অবশ্য এই ব্যাপারে খুবই কৌতূহলী হয়ে সাহিত্যের অঙ্গনটিকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছি। কারণ আমি নিজেতো কবিতাই লিখি। এবং একই সঙ্গে কবিতাকে বাঁচাতে চাই।

.এটা আমার দৃষ্টিতে কবিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারা যাচ্ছে না, সেটা হ দেশের সামগ্রিক পটভূমিটি একজন কবির কবিতা লেখার সময় উপলব্ধ হ কি-না। আমার মনে হয়, হয়-না। আমাদের কবিরা গ্রাম জনপদ থেকে এনে ঢাকায় সমবেত হলেও তারা পেছনে ফেলে আসা নিজেদের প্রাকৃতিক পরিবেশ, গ্রাম, জনপদ, নর-নারী, নৌকা, নদী এসব ঠিকমত সাহিত্যে যোগান দিতে পারছে না। পারছে না অবশ্য নিজের সচেতনতা এবং দেশমাতৃকা সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতার অভাবে। কবিতা লিখতে হলে জানতে হয়। এটা হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিককালের কথা। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ কবি জ্ঞানকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কাব্য রচনার প্রয়াসী হয়েছেন। এটা আক্ষেপের বিষয়। তারা নারীকে উত্থাপন করেন তাদের প্রেমিকা বলে। কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে তাদের কোন অভিজ্ঞতার পরিচয় কাব্যে পরিস্ফূট হয় না। এর কারণ তারা প্রেম সম্বন্ধে ভাল করে গভীরভাবে জ্ঞাত নন। এই সত্যই প্রকটিত হয়ে পড়ে।

আমি তরুণ কবিদের কোনকিছু না জেনে, না বুঝে, গভীরে না গিয়ে প্রেমের কবিতা লিখতে নিরুৎসাহিত করি। কারণ আমি দেখেছি সব তরুণ কবিই প্রেমের কবিতা লিখতে বেশি আগ্রহী। অথচ প্রেম সম্বন্ধে তাদের কোনও গভীরতর ধারণাই নেই। বর্তমান বাংলা কবিতায় এটাই হল প্রধান সমস্যা। তা বলে কাউকে নিরুৎসাহিত করার প্রবৃত্তি আমার নেই। আমার কথা হল ভাল করে জেনে লেখা ভাল। না জেনে একটি অক্ষর রচনাও অনুচিত।

আরো একটি কথা, কবির মধ্যে কেবল বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না। প্রকৃতির প্রতিও হয়। একটি গাছের প্রতি, একটি প্রান্তরের প্রতি, বিল-ঝিল ইত্যাকার বিষয়ের প্রতি তুমুল আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। এসব বিষয়ও প্রেমের তালিকায় রাখতে হবে। এমন ব্যাপারও দেখা যাবে যে একজন কবির প্রিয়তমা নারীর গ্রামের পাশে চানধল বিল বলে একটা জলাভূমির স্মৃতি কবির মধ্যে বারবার ফিরে আসে। এটাও এক ধরনের প্রেম। আমরা অনলংকৃত ভাষায় এটাকে বলি প্রকৃতি প্রেম।

কথা হল কবি যিনি–তাকে মনে রাখতে হবে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে তিনি স্বর্গচ্যুত হয়েছেন। হারানো সেই স্বর্গকে ফিরিয়ে দিতে পারে তার প্রাজ্ঞতা, অর্থাৎ জ্ঞানই।

ঢাকার সাহিত্য থেকে তথাকথিত প্রগতিবাদ এখন প্রায় নির্বাসিত। আর যারা সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা চর্চা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লেখালেখি শুরু করেছেন তারাও তেমন কিছু মহৎ রচনার মিনার তৈরী করতে পারেননি। এটা হল কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্তর্বিরোধের ফলশ্রুতি। যদিও একে আখ্যায়িত করা হয় আদর্শগত বিরোধ বলে। আমি এ ধরনের আদর্শগত বিরোধের ব্যাপারে কোনও পক্ষাবলম্বন করতে চাই না। আমার কাজ যেহেতু একটি ভাল কবিতা লেখার চেষ্টা করে যাওয়া, সে জন্য যে কেউ একটি ভাল কবিতা লিখলে আমি তা আগ্রহ নিয়ে পড়ি এবং প্রশংসা করি। একটি সুন্দর কবিতা লিখলে আর কিছু করতে হয় না। ওই কবিতাটি নিজের গুণে বিকশিত হয়ে সকলের কাছে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। আমি সবসময় একটি ভাল কবিতা লিখতে চেয়েছি। কাউকে পরাজিত করা কিংবা কারো সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমার স্বভাবের মধ্যেই ছিল না। আজও নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

সাহিত্য হলো কাল নির্ভরশীল। কবি-সাহিত্যিকরা চান বা না চান সময়ের অনেক চালচিত্র তীর্যকভাবে সাহিত্যে এসে ইতিহাস হয়ে যায়। স্বপ্নচারি কবিকে কেউ, বিশেষ করে ঐতিহাসিকরা স্বাক্ষী মানতে চান না।

কিন্তু দায়ে পড়লে কবি সাক্ষ্যকেই সত্য বলে গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হন। এখানেই কবিদের কল্পনাশক্তির সাথে বাস্তবতার মিশ্রণকে পাঠক মাত্রই প্রফুল্লচিত্তে মেনে নিয়ে স্বস্তিবোধ করেন।

কালিদাস নিঃসন্দেহে স্বপ্নকল্পনাচারী মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর কালের এই উপমহাদেশের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ ছিল। ফলে মেঘদূত বর্ণিত, লতাগুল্ম, মানুষ-মানুষী ও পশুপাখি সম্বন্ধে মেঘদূতের সাক্ষ্য আমরা নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করে আনন্দ পাই।

কবি শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী তা কেউ নির্ণয় করে যাননি। তবে একটা বিষয়ে সবাই একমত, কবি শুধু ছন্দবিলাসী নন, তিনি জ্ঞানীও বটেন। তিনি যেমন মেঘদূত রচনা করেন তেমনি তার হাত দিয়েই 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' এবং 'মুদ্রারাক্ষস'এর মতো গ্রন্থ প্রণীত হয়।

আমার কালের কবিতা যদিও চরাচরে অতটা প্রভাবশালী নয়, কিন্তু বিজ্ঞান প্রযুক্তি আধুনিকতা ও মানুষের দুর্বার গতিশক্তির দোহাই দিয়ে কেউ মানুষের কবি প্রতিভাকে নির্বাসিত করতে পারেনি। কবি মুখে যদিও বলেন তিনি কবি ছাড়া আর কিছুই নন, প্রকৃত প্রস্তাবে কে না জানে তিনি জাগতিক সব ব্যাপারে নাক গলাতে অভ্যস্ত। এর ফলে কালে কালে তার লাঞ্ছনা কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটেনি। কিন্তু তবু তিনি মানুষের ভালোবাসা পেয়ে এসেছেন।

অনেক সময় দেখা গেছে কবি ক্রুদ্ধ জনতার মিছিল থেকে নিজকে সরিয়ে একাকী ফুটপাথ ধরে হেঁটে চলেছেন। কোথায় যেন পড়েছিলাম, ফরাসি বিপ্লবের সময়কার ঘটনা। জনতা সিনেটর সিনাকে হত্যা করতে রাস্তায় মিছিল নিয়ে এগোচ্ছে। ওই সময় 'সিনা' বলে একজন কবিও সেই শহরে বাস করতেন। তিনি ওই ফুটপাথ ধরে একাকী হেঁটে যাচ্ছিলেন। কে যেন দেখিয়ে দিলো ওই তো 'সিনা'।

জনতা তাকে হত্যা করার জন্য দ্রুত ফুটপাথে উপচে পড়ল। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সিনা চিৎকার করে বললেন–'আমি সিনেটর নই, আমি সিনা দি পয়েট'। জনতার ভেতর থেকে ক্রুদ্ধ কারো কণ্ঠস্বর শোনা গেল– 'কিল হিম ফর হিজ ব্যাড ভার্স।'

এই হলো জনরোষের সামনে কবির অবস্থা। মিছিল কোনো কৈফিয়ত শোনে না। তার কাজ হলো কেবল মাড়িয়ে যাওয়া। মানুষের রিজনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেবল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতো সব কিছু পদদলিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

কবিও এগিয়ে চলেন। তবে তিনি চকিত হরিণের মতো দ্রুত এক পলক ছেড়ে আসা পথের দিকে তাকান।

একবার অতীতের দিকে এক পলক, তারপর সামনের দিকে আর এক পলক। তাকে এগোতে হয় বিবেচনা শব্দটিকে ঘাসের মতো দাঁতে চিবোতে চিবোতে। কারণ তার পেছনে শিকারির তাক করা বন্দুকের নল অপেক্ষা করছে। এক্ষুণি ছুটে আসবে বারুদ, যদি তিনি যথেষ্ট সচকিত প্রাণের পরিচয় না দেন।

তারপরও এ প্রশ্ন কেন, সমাজে কবির প্রয়োজন কী? হয়তো একদিন মানুষের বিজ্ঞানমনস্কতা এই প্রয়োজনের বিরুদ্ধে সব প্রস্তুতি নিয়ে যুক্তির কাঠগড়ায় কবিকে দাঁড় করাবেন। তবে সে সময়ের কৈফিয়ত সেই সময়কার কবিই দেবেন। আমরা তার বক্তৃতাটা কী হবে তা আন্দাজে আগাম লিখে দিতে পারলেও লিখব না। কবিকে ধর্ম নির্বাসন দিতে গিয়েও দেননি। ইতিহাস কবির সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েও সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞান তোতলাতে তোতলাতে বলেছেন, থাকুন না তিনি, কারণ আমাকেও তো মাঝে মধ্যে আন্দাজের ওপর নির্ভর করতে হয়, হাতড়াতে হয়।

কবি এসব দেখে এক পা এগিয়েই দুই পা পিছিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, 'আমি শুধু কবি আর তো কিছু নই। আমার একটাই দোষ–সেটা হলো আমি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, আমার মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি ভাসে। ভাসে কত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদী কত নারী। আমি ফুল ভালবাসি। কারণ তার আয়ু এক দিন মাত্র। পরের দিন সে আবর্জনা স্তুপে চলে যায়।

সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী যারা আমি তাদের মধ্যেই থাকি। কিন্তু আমার স্থায়িত্ব দৈব নির্ধারিত। মানবজাতির আমাকে ভালো না বেসে গত্যন্তর নেই। কারণ আমি ছন্দ জানি। মিল রচনা করি। আমার হাতে তাল ভঙ্গ হয় না। আমি প্রতিটি ভাষার সম্ভবপর সঙ্গীতের উদগাতা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~